গুলা, ছোট এলাচ ছাড়াইয়া তাহার দানাগুলি, লঙ্গ, দারচিনি আর ঐ ঘি সমেত ভাজা পেঁয়াজ সমস্ত উহার উপরে ঢালিয়া দাও। তারপরে হাঁড়ির মুখে সরা চাপা দিয়া দাও। প্রায় আধ পোয়া ময়দা জল দিয়া গাঢ় করিয়া কাইয়ের মত করিয়া গোল। তারপরে সরার চারিধারে এই ময়দা-গোলা দিয়া আঁটিয়া দাও, যাহাতে সরা ও হাঁড়ির মুখ একেবারে আঁটিয়া যায়। কিছুতেই যেন হাঁড়ির ভিতরের ভাপ না বাহির হইতে পারে। এখন কাঠের কয়লার উনানে হাঁড়ি চড়াইয়া দাও। মাঝে মাঝে হাঁড়িটা ঘুরাইয়া দিবে। কাণ দিয়া শুনিবে যতক্ষণ না হাঁড়ির ভিতরে গুড়গুড় শব্দ শুনিতে পাইবে ততক্ষণ মাঝে মাঝে হাঁড়ি ঘুরাইয়া নাড়িয়া দিবে, এবং বুঝিবে যে ইহাতে এখনও জল আছে। যখন শোঁ শোঁ শব্দ হইতে থাকিবে তখন, বুঝিবে জল মরিয়া গিয়াছে এবং তখন নামাইবে। এইবারে উনানে হইতে জলন্ত কয়লাগুলা একেবারে উঠাইয়া ফেল, ইহাতে উনানের আঁচ একেবারে মন্দা হইয়া যাইবে। এই মন্দা আঁচে হাড়ি প্রায় মিনিট দশ বসাইয়া রাখ তাহা হইলে এই দমে থাকিয়া মশলা প্রভৃতি আরো ভালরূপ কসা হইয়া যাইবে। এখন নামাইয়া খাইবার জন্য দিবে। অথবা যে পর্য্যন্ত না খাইতে দিবে সেই পর্য্যন্ত গরম ছাইয়ের উপরে থাকিলে ভাল। মাছের হাঁড়িটা যখন হইতে আগুণে চড়ান গিয়াছে তখন হইতে প্রায় মিনিট ত্রিশ সময় লাগে।

অন্যান্য মাছেরও দম্পক হইয়া থাকে।

গুণাগুণ।—রোহিতঃ সর্ব্বমৎস্যানাং বরোবৃষ্যোঽর্দ্দিতার্ত্তিজিৎ।
কষায়ানুরসঃ স্বাদুর্বাতঘ্নো নাতিপিত্তলঃ॥

(রাজবল্লভ)

রুই মাছ মাছের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধাতু পুষ্টিকর, অর্দ্দিত বায়ু নাশক, কষায় রস, স্বাদু, বাতনাশক ও অতি পিত্তকর নহে।

ভোজন বিধি।—লুচি বা ভাতের সঙ্গে খাও। বিশেষতঃ লুচিতে খাইতে ভাল।

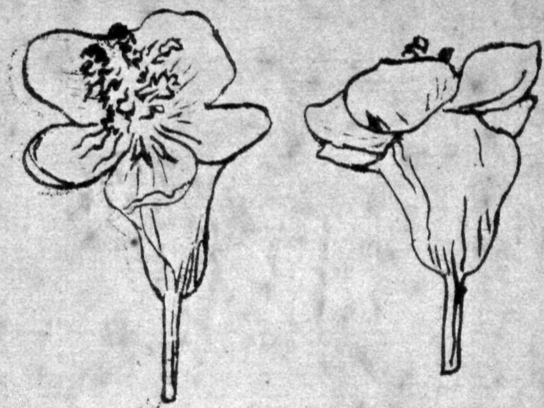
শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

# পুষ্পের বিবাহ।

মনুষ্য বা অপরাপর জীব জন্তুদিগের মধ্যেই কেবল স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি জাতিভেদ আছে ইহাই সাধারণ লোকে অবগত আছেন। কিন্তু কয়জন স্বভাবের সকল বিষয় সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া তাহাদের বিষয় মনোমধ্যে আলোচনা করিয়া থাকেন। আমাদের চতুঃপার্শ্বে অতি সামান্য বস্তুতেও যে ঈশ্বরের কত শত আশ্চর্য্য কৌশল নিহিত আছে তাহার সীমা নাই।

কিছু দিবস গত হইল বিলাতের একখানি প্রসিদ্ধ পত্রে মনুষ্য পশু-পক্ষির ন্যায় লতা পুষ্পাদির মধ্যেও স্ত্রীপুরুষ আছে, তাহাদেরও যে সময়ে সময়ে উভয়ের সম্মিলনে বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই সকল বিষয়ের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পুণ্যের পাঠক পাঠিকাগণের জন্য উক্ত প্রবন্ধ হইতে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। পুষ্পাদির মধ্যেও যে বিবাহ হইতে পারে একথা বলিলে অনেকেই সহজে বুঝিবেন না, কিন্তু কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে কতকগুলি পুষ্পের রেণু (Pollen) অপর কতকগুলি পুষ্পের উপর পতিত হইয়া বীজ সমুদায়কে উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করে। বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, যে সকল পুষ্পে মধুমক্ষিকা বসিয়া থাকে সেই সকল পুষ্পে বীজ উৎপন্ন হয়। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য কারণ মক্ষিকাগণ তাহাদের পক্ষ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদের দ্বারা এক পুষ্পের রেণু অপর পুষ্পে আনয়ন করে এবং তদ্দ্বারা উহাকে ফল ও বীজোৎপাদিকা শক্তি প্রদান করে।

কোন্ পুষ্পটি পুরুষ কোন্‌টি স্ত্রী ইহা বুঝাইতে হইলে, পাঠক পাঠিকা-গণের সম্মুখে পুষ্পটি না উপস্থিত করিয়া কেবল লিখিয়া বুঝান কঠিন। সুবিধা বিবেচনা করিয়া বিগোনিয়া নামে এক জাতীয় বিলাতী পুষ্পের বিষয় বলিয়া ও তাহাদের চিত্রাদি দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। এই পুষ্প এ দেশেও আজকাল অনেক সখের বাগানে দেখিতে পাওয়া যায়;



১ম চিত্র স্ত্রী বিগোনিয়ার সম্মুখ ও পশ্চাৎ দৃশ্য।



২য় চিত্র পুরুষ বিগোনিয়ার সম্মুখ দৃশ্য।

যাহাদের দেখিবার সুবিধা আছে তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়া এই প্রবন্ধের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

বিগোনিয়া অনেক প্রকার আছে; তন্মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই তিনটি পুষ্প একটি পল্লবে পাশাপাশি প্রস্ফুটিত হইতে দেখা যায়। পার্শ্বের দুই-টিই সচরাচর পুরুষ হইয়া থাকে; কখনও বা একটি পুরুষ দুইটি স্ত্রীও হইয়া থাকে। এই স্ত্রী ও পুরুষ পুষ্পের আকার অবয়ব এত প্রভেদ যে দুইটীকে স্বতন্ত্র দেখিলে উহারা যে একই বৃক্ষের পুষ্প তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। মনুষ্যদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ দেখিতে যত প্রভেদ ইহারাও তদ্রূপ; প্রথম ও দ্বিতীয় বা তৃতীয় চিত্র দেখিলে ইহা অনায়াসেই উপলব্ধ করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ পুরুষ বিগোনিয়ার চারিটি পাপড়ি, স্ত্রী বিগোনিয়ার পাঁচটি, এবং পুরুষের পাপড়িগুলি সমান নয় দুইটি ছোট দুইটি বড়। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী পুষ্পের মধ্যস্থলে এক প্রকার সরু সরু কোঁক-ড়ান পদার্থ আঠার দ্বারা আবৃত থাকে, যাহা পুরুষ পুষ্পে থাকে না, তৎ-পরিবর্ত্তে সেই স্থানে রেণুপূর্ণ ক্ষুদ্র ডিম্বের ন্যায় গোল গোল এক প্রকার পদার্থ থাকে। মধুমক্ষিকাগণ মধুপান করিতে আসিলে ঐ গোল গোল পদার্থ গুলিকে অতিক্রম করিয়া পাপড়িগুলির গোড়ায় যে স্থানে মধু থাকে তথায় যাইতে হয়, তাহাতে তাহাদের গাত্রে ও পক্ষে রেণু সকল লাগিয়া যায়। পরে যখন তাহারা কোন স্ত্রী পুষ্পের উপরে বসে তখন তাহাদের গাত্রের ও পক্ষের রেণু ঐ পুষ্পের বীজকোষে পতিত হইয়া বীজগুলির উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করে। পুরুষ পুষ্পের ক্ষুদ্র জীবনের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা ইহাই; এইবার তাহারা ক্রমেই শুষ্ক হইতে থাকে, পরে বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হয়। স্ত্রী পুষ্পগুলি এত শীঘ্র শুকায় না, তাহারা আরও কিছু দিবস উত্তম অবস্থায় থাকিয়া বীজগুলিকে পরিপক্ক করিতে থাকে। উত্তম অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পুষ্পরেণু পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে উহারা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্বের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ অতিশয় পাতলা খোলার দ্বারা আবৃত, উহার ভিতরে আঠার ন্যায় চটচটে এক প্রকার পদার্থ থাকে। ঐ রেণুগুলি যখন স্ত্রী পুষ্পের উপরি-ভাগের সূক্ষ্ম পদার্থের সহিত ঘর্ষিয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাদের খোলাগুলি

ভাঙ্গিয়া তন্মধ্যস্থিত পদার্থ পুষ্পের উপরিস্থিত একটি সরু নলের ভিতর দিয়া বীজকোষে পতিত হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা যাহা অধিক প্রভেদ ও প্রয়োজনীয়, যাহা থাকিলে বাস্তবিক পুরুষ হইতে স্ত্রীর পার্থক্য বুঝা যায়, তাহা এখনও বর্ণিত হয় নাই। প্রথম চিত্রের নিম্নাংশ দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবেন যে উহার পশ্চাতে অর্থাৎ বৃন্ত এবং পাপড়ির মধ্যে একটি বৃহৎ ত্রিকোণ বিশিষ্ট বীজকোষ (Ovary or seed capsule) রহিয়াছে। এইবার দ্বিতীয় চিত্র দেখিলে বোধ হয় কোন পাঠক পাঠিকাই পুষ্পাদির স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি জাতিভেদের বিষয় সন্দেহ করিবেন না, ইহার বীজকোষ একেবারে নাই। চতুর্থ চিত্রে একটি বীজকোষের অর্দ্ধাংশের প্রতিরূপ দেওয়া হইল। আমরা স্ত্রী জন্তু বলিতে ইহাই বুঝিয়া থাকি যাহারা সন্তান বা ডিম্ব প্রসব করে, তবে যে সকল বৃক্ষ বা পুষ্প বীজ প্রসব করে তাহারাই বা স্ত্রী জাতীয় কেন না হইবে॥

শ্রীঃ—

---

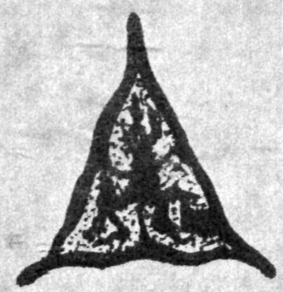
# ছাতুবাবুর গান। *

রাগিণী সরফরদা—জলদ তেতালা।

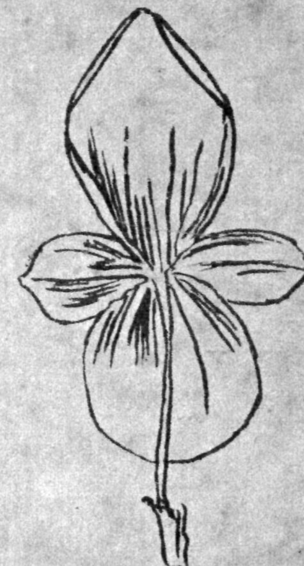
এমা তারা ভবদারা অপরা ত্রিদেব করা।
পতিত ভবার্ণবে আর কত দুখ দিবে
আশুতোষে দীনে হ'য়োনা গো চরণে পাসরা॥

---

* এই গানটী কলিকাতার প্রসিদ্ধ বাবু ৺আশুতোষ দেব কর্ত্তৃক রচিত। ৺আশুতোষ দেব সাধারণে "ছাতুবাবু" নামে প্রসিদ্ধ। এ গানটী এ পর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।



৪র্থ চিত্র বীজকোষ।



৩য় চিত্র পুরুষ বিগোনিয়ার পশ্চাৎ দৃশ্য।

তালি। ২ (স্বা) । ৩ । ০ । ১ ॥
মাত্রা। ৩, ১ (স্ত) । ৪ । ৪ । ৪ ॥

(স্বা) II রে২ গা২। + গা২ পনিঁ ধা। ধনিঁ পা
(স্বা) II এ —। — মা —। — —

মা মপা। মা মা½ পা½ গা২। ঋগা রে৩। গা মা পা২।
— তা। — — — য়া। ভ —। ব — —।

মা গা মা রে। গ½ সা½ সা + সা II। সা২ গা
দা — — —। — — য়া — II। অ প

রে। গা২ মা২। গা½ রে½ গা২। রে২ সা২। ধা২
—। য়া —। — — —। — —। ২......
—

নি২। সা২ ধা২। ধনি সা + পা মা। মা২
...। — —। — — — ত্রি। দে
—

সা২। রে৩ সা। সমা২ পা২। গমা½ মা½ পা২। পা
ব। ক —। — —। — — —। —

মা পা২। মপা½ মা½ পা২। পা মা পা২। মপা½ মা½
— —। — — —। — — —। — —

ধা২। ধনিঁ পা পনিঁ½ ধা½ নিঁ। ধা পা মা মপা।
—। — — — — —। য়া — — তা।

মা + মা½ গা½। ঋগা রে২
— — য়া। ভ —

২ ২........................
(স্ত): —পা। পা পসা ধা সা। সা সা সা নি।
(স্থ): —প। তি ভ — —। ভ বা — —।

২.............. ২............................. ২
সা সা সা২ নি২। সা৩ সা। সা সূরে সা২। নৃসা
— ণ বে —। — আ। র ক্ত। হ্

২ ২......................... ২
নি নি২ সা২ ধা২ নি২। সা২ রে২ সা সা২। নৃসা ধা
— — — খ —। — — দি বে। — —

ধা পা পা। পা২ মা২ গা২ মা। পা৪। ধা২ নি২
— — আ। শু ভে — —। বো। দী নে

২.................................... ২
সা২ সগা রে২ সা২। সা২ সা২। ধৃসা ধা৩। ধৃনি
হো মো — —। না গো। চ —। —

২.............................................. ২
পা ধা২ নি২ সা২ রে২। রে সা৩। + স২ নৃসা ধা।
— র — — —। মে —। — পা —।

ধৃনি পা২ পৃধা। মা মা২ গা২ গা২। বৃগা রে৩। গা
— — স। — — — রা। ভ —। র

মা পা। গৃমা গা গৃমা রে। বৃগা২ সা২ সা২। রেঃ ॥ ॥
— —। দো — — —। — — রা। এ ॥ ॥

১। স্থা = অস্থায়ী। স্ত = অন্তরা।

২। স্বরের পাশে সংখ্যা চিহ্ন = মাত্রাচিহ্ন। যথা সা২ = দ্বিমাত্রিক সা।

সা$\frac{3}{4}$ = সা$\frac{1}{4}$ + সা$\frac{1}{4}$ + সা$\frac{1}{4}$। পা$\frac{3}{2}$ = পা$\frac{1}{2}$ + পা$\frac{1}{2}$ + পা$\frac{1}{2}$ = পা১ + পা$\frac{1}{2}$ = পা + পা$\frac{1}{2}$।

৩। চন্দ্রবিন্দু চিহ্ন ँ = কোমলের চিহ্ন।

৪। সুরের উপরে ২ সংখ্যা চিহ্ন = দ্বিতীয় সপ্তক বা তার সপ্তকের চিহ্ন। সুরের নিম্নে ২ সংখ্যা চিহ্ন = দ্বিতীয় নিম্ন সপ্তক বা মন্দ্র সপ্তকের চিহ্ন।

যদি একই উচ্চ সপ্তকের কতকগুলি সুর পরে পরে থাকে তাহা হইলে প্রথম সুরটীর উপরিস্থিত সপ্তক চিহ্ন হইতে ফুটকি বা ক্ষুদ্র কসি টানিয়া যাইতে হইবে।

ঐরূপ যদি একই নিম্ন সপ্তকের কতকগুলি সুর পরে পরে থাকে তাহা হইলে প্রথম সুরটীর নিম্নস্থিত সপ্তক চিহ্ন ফুটকি বা ক্ষুদ্র কসি টানিয়া যাইতে হইবে। যথা সা$\frac{1}{2}$ রে$\frac{1}{2}$ সা২। ধা২ নি২ ইত্যাদি।

৫। সুরের নিম্নে হসন্ত চিহ্ন = হসন্ত বা খণ্ডমাত্রিক চিহ্ন, এই হসন্ত মাত্রিক সুরটীকে ছুঁইয়াই চলিয়া যাইতে হইবে।

৬। পর পর সুরগুলির মধ্যে + যোগচিহ্ন থাকিলে সেগুলি একটানে গাহিতে হইবে।

৭। যুগল আই ( II ) চিহ্ন = দুইবার আবৃত্তির চিহ্ন।

৮। বিসর্গ চিহ্ন ( ঃ ) = সমের চিহ্ন।

৯। এই গানটীর প্রারম্ভেই তালি ও মাত্রা বিভাগের যে সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে তাহার অর্থ এই গানটীর প্রত্যেক তালিই ৪ মাত্রা করিয়া। দ্বিতীয় তালিতে আস্থায়ী আরম্ভ হইবে। এবং দ্বিতীয় তালির তিন মাত্রার পর এক মাত্রায় অর্থাৎ চতুর্থ মাত্রায় অন্তরা আরম্ভ।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

## মাঠে—নিশীথ চিত্র।

নীলাকাশ ছায়াময় ক্ষীণ চন্দ্রালোক ;—
নীরব রজনী এবে নাহি কোনো লোক
উদাসীর মত যেন একটী পাদপ
নিশীথে মাঠের মাঝে দাঁড়ায়ে একেলা,
এ অনন্তে করে ধ্যান কার নাম জপ।
কি শান্ত প্রকৃতিরে মাঠে রাত্রি বেলা
ঝিলি ডাকে ঝোঁপে ঝাঁপে স্তব্ধ তরুতলে
ডেকে ওঠে দূর হ'তে শৃগালেরা দলে
দূরে গ্রাম গাছপালা অন্ধকারময়
না জানি তাহার মাঝে কত দীপ জ্বালা
কুটীরে কুটীরে শোভে,—কত কুলবালা
শিশুরে পাড়ায় ঘুম, স্নেহ কথা কয়।
নিস্তব্ধ মাঠের কোলে কিবা স্বপ্নময়
জাগিতেছে তরুলতা গ্রাম লোকালয়।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

## বাঙ্গলা ও আসামী ভাষা অভিন্ন নহে।

আসামী নব্য যুবক দল মাতৃভাষার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে গিয়া যে কেমন করিয়া বাঙ্গালীর ও বাঙ্গলা ভাষার বিদ্বেষী হইল বলিতে পারি না। তাঁহারা নিজের জীর্ণ গৃহের সংস্কার করিতে গিয়া কি করিয়া বঙ্গীয় লেখকের গৃহদাহ চেষ্টা দোষে দোষী হইল বুঝিতে পারা গেল না। ১৩০৫ সনের



রে. কা. হি. না. ঠা.

মাঠে নিশীথচিত্র।

আশ্বিন মাসের ভারতীতে কোন আসামপ্রবাসী বঙ্গীয়ভ্রাতা "আসামের কথা" শীর্ষক আর একটী প্রবন্ধ লিখিয়া মাতৃভাষার উন্নতি সাধনেচ্ছু আসামী নব্য যুবকদলকে আক্রমণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "এইরূপ প্রচলন হইলে যে বাঙ্গালী এবং আসামী উভয়ে একীভূত হইয়া মহৎ কল্যাণ লাভের অধিকারী হইতে পারেন একথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? ভারতবর্ষের জলবায়ুর এমনই একটী অনৈক্য উৎপাদনী শক্তি আছে যে এই অনায়াসসাধ্য সম্মিলনেরও বাধা দিবার জন্য একদল লোক প্রস্তুত হইয়া আছেন। ইহাদের মধ্যে এমন কয়েকজন যুবক আছেন যাঁহারা বাঙ্গলা দেশে পাঠাভ্যাস করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন এবং বাঙ্গালীদিগের সহিত মিশিয়া আমোদ আহ্লাদ আহারাদি করেন, অথচ এই একীকরণের প্রস্তাব শুনিলে এমনই উত্তেজিত হইয়া উঠেন যে যুক্তি তর্ক ভুলিয়া গিয়া প্রস্তাবকারীকে গালাগালি দেন * * * * উল্লিখিত কথার অনেক গুলি যুক্তিহীন না হইলেও প্রধান বিবেচনার বিষয় এই যে আসামী ভাষাকে প্রাদেশিক উপভাষারূপে থাকিতে দিয়া লেখাপড়ায় সুগঠিত বাঙ্গলা চর্চ্চা করিয়া সাহিত্য বিষয়ে বাঙ্গালীর সমকক্ষ হওয়াই উচিত, না নূতন আসামী সাহিত্য গঠন করিতে চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালী অপেক্ষা শত বৎসর পশ্চাৎ হইয়া থাকা উচিত। * * * যে দেশে হিন্দুস্থানীর বিশেষত্ব এই যে যিনি বড় হিন্দু তিনি নিজের স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি কাহারও দ্বারা প্রস্তুত অন্নও গ্রহণ করেন না সেই দেশে যে অপরের গঠিত সাহিত্য গৃহীত হইবে তাহার সম্ভাবনা অল্প। তবে আশার স্থল এই যে এখনও আসামে এমন সকল লোক আছেন যাঁহারা আসামী ভাষাকে সাহিত্যের উপযোগী বলিয়া মনে করেন না। আসামের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি আউনি আটির শ্রীমন্নহরি দত্ত দেব গোস্বামী ইহাদের অন্যতম। * * * ইনি নিজে বাঙ্গলায় সঙ্গীত রচনা করেন। আসামের নব্য সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি শ্রীযুক্ত রায় জগন্নাথ বড়ুয়া বাহাদুরও বাঙ্গলাবিদ্বেষী নহেন। ইনি বাঙ্গালীদিগকে নিজভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের সহিত একত্র বসিয়া আহার করেন। শ্রীযুক্ত রায় মাধবচন্দ্র বড়দলৈ বাহাদুরও বাঙ্গলা ভাষার পক্ষপাতী। ইহাদের দৃষ্টান্তে

কালে বাঙ্গালী এবং আসামী যে এক হইয়া যাইবে এরূপ আশা করা যায়।"

শ্রীযুক্ত রায় জগন্নাথ বড়ুয়া বাহাদুর, মাধবচন্দ্র বড়দলৈ, শ্রীমন্মহর্ষি দত্তদেব গোস্বামী বাঙ্গালী বিদ্বেষী নহেন, শুধু নব্য যুবক দলই বাঙ্গালী বিদ্বেষী; কারণ তাঁহারা আসামী ভাষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। আরো পূর্ব্বোল্লিত আসামের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি তিন জন নিজ মাতৃভাষা-বিদ্বেষী! ভারতীর লেখকের এই নূতন ধরণের চাতুরী দেখিয়া বিস্মিত ও লজ্জিত হইতে হয়। তিনি আমাদের আসাম দেশের এই তিন জন বড় লোককে আমাদের মধ্য হইতে পৃথক্ করিয়া নিজ মতের গুরুত্ব প্রতিপাদনে যত্নবান হইয়াছেন। ইহা কি Divide and conquer পলিসির খেলা নহে? হইতে পারে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই কূট ভেদনীতি দ্বারা আসামী ও বাঙ্গালীর মধ্যে অনৈক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু ভারতীর লেখকের ন্যায় বঙ্গের কোন কোন লেখক আসামবাসীদিগের মধ্যে যাহাতে গৃহবিবাদ বাধে, একতা দূর হয় তজ্জন্য বড় কম কৌশল খাটাইতেছেন না।

আউনি আটীর গোস্বামী বাঙ্গলা ভাষায় সখ করিয়া সঙ্গীত রচনা করেন, কি বাঙ্গলা ভাষায় যাত্রা অভিনয়াদি করান, বলিয়া তাঁহাকে মাতৃভাষার বিরোধী স্থির করা যাইতে পারে না? তিনি যদি আসামী ভাষাবিদ্বেষী হইতেন তাহা হইলে বার বৎসর ধরিয়া আসামী ভাষায় "আসাম বিলাসিনী" নামক পত্রিকা নিজ ব্যয়ে এবং নিজ পরিশ্রমে আউনি আটী সত্র হইতে বাহির করিতেন কি? আসাম বিলাসিনীর পর "আসামতরা" নামক আরেক খানি পত্রিকা তাঁহার আউনি আটি সত্র হইতেই বাহির হইত না? জর্ম্মাণ কি ইংরাজী কিম্বা ফরাসী ভাষায় সঙ্গীত, কবিতা অথবা প্রবন্ধ লিখিবার আমার ক্ষমতা, ইচ্ছা এবং সময় আছে, আমি লিখি আর সেই সঙ্গে সেই ভাষাগুলির চর্চ্চাও করি, তাহা বলিয়াই কি আমি মাতৃভাষাকে নিজদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাহার স্থলে ইংরাজী, কি জর্ম্মাণ, কিম্বা ফরাসী ভাষা স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইলাম? সুরেন্দ্র বাবু ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন, নরেন্দ্র বাবু ইংরাজীতে লেখেন বলিয়া, কৈ কোন শিক্ষিত বঙ্গালীকে তাঁহাদের বঙ্গলাভাষাদ্বেষী বলিতে শুনি

নাই ত। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বড়দলৈ মাতৃভাষার বিপক্ষ, এটা একটু নূতন খবর বটে। কিন্তু তিনি যদি মাতৃভাষার অহিতাকাঙ্ক্ষী হইতেন, তাহা হইলে আজ আসামী ভাষায় তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমপ্রসূত দুই তিন খানা পুস্তক দেখিতে পাইতাম না। আমরা জানি, আজও বড়দলৈ মহাশয়ের উদ্যোগ, যত্ন ও ব্যয়ে আসামী রামায়ণ ও মহাভারত প্রসার লাভ করিতেছে। রায় জগন্নাথ বড়ুয়া বাহাদুরের বিষয়ে যে কথাটি বলিয়া ভারতীর প্রবন্ধ লেখক স্বমত সমর্থন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা অতীব অদ্ভুত। বড়ুয়া মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালী বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া স্বগৃহে এক সঙ্গে আহার করেন বলিয়াই কি তিনি আসামী ভাষার বিরোধী প্রমাণিত হইলেন? ভারতী লেখকের "নব্য আসামী যুবক দলের" মধ্যেও এমন অনেক ব্যক্তি কি নাই যাঁহারা বাঙ্গালীর সঙ্গে একাসনে বসিয়া আহার করেন? নিজ মাতৃভাষার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে যাওয়ায় যে আসামী নব্য যুবকদল বাঙ্গালীর শত্রুতাচরণ করিতেছে, ইহা যে নূতন কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। মাতৃভাষার উন্নতি করিতে প্রয়াসী হওয়াটা যে ক্রিমিন্যাল্ (criminal) ইহা এক্ষণে ভারতীর লেখকের কাছে নূতন শিক্ষা করা গেল।

আসাম দেশের হিন্দুয়ানীর বিশেষত্ব লইয়া ব্যঙ্গ করিয়া ভারতী লেখক বাঙ্গলা সাহিত্যে আসামীদিগের গ্রহণ না করিবার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। বঙ্গদেশের গোঁড়া হিন্দুদের হিন্দুয়ানীরও এ রকম অনেক বিশেষত্ব আছে, যাহা ঈশ্বরের কৃপায় আজ পর্য্যন্ত আসাম দেশে প্রবেশ করে নাই, আর যে সব বিশেষত্বের বিষয় ভদ্র সমাজে উল্লেখ করিতেও আমরা সঙ্কোচ বোধ করি। যাহা হউক রাষ্ট্রবিপ্লবের কথা বলিতে গিয়া লেখক যে শুধু শুধু আসামী হিন্দুদের নিন্দা করিয়া বাঙ্গালী ও আসামীর মধ্যে ভ্রাতৃভাবের ধ্বজা উত্তোলন করিতেছেন, এই কথাতে তাঁহার বাহাদুরী আছে বটে।

বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য অল্পকালের মধ্যেই একটু সবল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই কি লেখক আত্মবিস্মৃত হইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতে মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিজের শরীরে একটুমাত্র শক্তি অনুভব

করিয়া নিজেকে মুনিয়াদি স্থির করিয়া বারংবার আসামী ভাষাকে বাঙ্গলা ভাষার অপভ্রংশ বা উপকণ্ঠ ভাষা বলিয়া যে চীৎকার করেন তাহা ভ্রম সংস্কার বশতঃ। হায়! তাঁহারা জানেন না যে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীরামপুরের মিশানারীরা লিখিত বাংলা ভাষার প্রথম সৃষ্টি করিলেন; অথচ আসাম দেশে রামায়ণ, মহাভারত, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ চারিশত বৎসরেরও পূর্ব্বে আসামী ভাষায় অনুবাদিত ও প্রণীত হইয়াছিল। *

রেভারেণ্ড এম্ ব্রন্সন তাঁহার প্রণীত আসামী ভাষার অভিধানের ভূমিকায় লিখিয়াছেন "ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাবাসী লোকেরা আসামী ভাষাতে কথা কহে। আসাম দেশে আসামী ভাষা অতি পুরাতন কাল হইতে অখণ্ড প্রবাহে প্রচলিত রহিয়াছে। আর ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে রাষ্ট্রবিপ্লব, অত্যাচার, কুশাসন প্রভৃতি ভূরি ভূরি দুর্ঘটনার মধ্যেও আসামী ভাষার কোনও বিশেষ ক্ষতি বা পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

"বহুশতাব্দী ধরিয়া শানবংশীয় অনার্য্য আহম রাজাদের অধীনে থাকিয়াও আসামী ভাষার নিজের প্রভাব অপ্রতিহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ব্রহ্মবাসী, মুসলমান ও কাছারী প্রভৃতির প্রবল আক্রমণে আসাম দেশ ক্ষতবিক্ষত হইয়াও নিজ ভাষাকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় আসামীরা তাহাদের মাতৃভাষাকে কতদূর ভালবাসে।

"দুর্ভাগ্য বশতঃ গবর্ণমেণ্টে মনে এমন একটি ধারণা জন্মিয়াছে যে আসামী ভাষা ও বাঙ্গলা ভাষা বুঝি একই। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়

---

* "For years the Assamese Language has been officially recognized and now it can be proved that it is in its Grammar much more nearly connected with the Behari than with Standard Bengali which can scarcely be said to have existed as a written Language until the beginning of the present century when Missionaries of Seerampore first moulded it into a form. On the the other hand, the Mohabarat and Ramayan were translated into the Assamese Language nearly four centuries ago. Not only that, but many other works on history were then written; poetry, medicine and religion were also translated into the Assam Vernacular, which could besides boast of a very pretty indigenous literature of its own." Dr. Grierson in the "India Antiquary."

গবর্ণমেণ্ট স্কুল সমূহে আরো কোর্টে বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা আসামীবাসী জনসাধারণের উন্নতি ও শিক্ষাকে অত্যন্ত বিঘ্ন ঘটিয়াছে। আসামীরা কখনও নিজের আসামী ভাষা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী বাঙ্গলা ভাষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহে। আজ যদি ইংরাজ এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে আসামী ভাষা অন্যান্য ভাষাকে পশ্চাতে ফেলিয়া নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিবে সন্দেহ নাই, কারণ ইহা জনসাধারণের ভাষা।

"আসামী ভাষা ও বাঙ্গলা ভাষার সাধারণ অনেক শব্দের মিল থাকিলেও ইহাদের ব্যাকরণের সম্পূর্ণ প্রভেদ রহিয়াছে তাহা তুলনা করিলেই দেখা যায়। এই দুই ভাষারই মূল যখন সংস্কৃত তখন ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। * আমার ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়াছে যে আসামী ভাষা অবহেলার বিষয় নহে।"

বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন ভ্রম সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা ভাষা আসামে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ব্রন্সন সাহেব তখন উপরের এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ মিল সাহেব বলেন "সুপণ্ডিত ভাষাবিৎ মিঃ ব্রাউন আসামী ভাষাকে অতি সুন্দর সরল ভাষা বলিয়া গিয়াছেন, আর তাহার সহিত বাঙ্গলা ভাষার ঐক্য অপেক্ষা অনৈক্য অত্যন্ত অধিক বলিয়াছেন। এই জন্য আমার বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট আসামে বাঙ্গলা ভাষা চালাইবার হুকুম দিয়া বড়ই ভুল করিয়াছেন।" † হাণ্টার সাহেব তাঁহার ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেন, "আকৃতি, প্রকৃতি ইতিহাস ও ভাষা বিষয়ে আসামী হিন্দু ও ভারতবর্ষের অন্যান্য হিন্দুদের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়।" মিসেস ওয়ার্ড তাঁহার 'গ্লিম্পস্ অব আসাম' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ;— আসামী ভাষাকে অনেকেই বাঙ্গলা ভাষার অপভ্রংশ বলেন কিন্তু যাঁহারা

---

* It might as well be said that French and Italian are one language, because both are sprung from the Latin, as that Bengalee and Assamese are one because they borrow in common from the Sanskrit. Rev. M. Bornson.

† Mill's Report on the Province of Assam. Para. 29. Page 28.

ইহাকে ভাল করিয়া আলোচনা ও শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা তাহা কখনই বলিতে পারেন না। আসামী ভাষার সুপণ্ডিত ভাষাবিদেরা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে আসামী ভাষা অতি বিশুদ্ধ ও ঐশ্বর্য্যশালী। ইহা নিজের বাক্যপদ নির্ব্বাচন প্রণালীতে স্পষ্টতঃ স্বতন্ত্র। বাঙ্গলাও হিন্দী ভাষার মত ইহার মূল সংস্কৃত। সেইজন্য সেই সেই ভাষার অনেক শব্দ ইহাতে পরিলক্ষিত হয়।

That the languages [Assamese and Bengalee] are quite distinct, no better proof is needed than the fact that a Bengalee does not understand an Assamese and *vice-versa*. Officers who understand Bengalee very well are quite at a loss when they hear Assamese, Pure and simple, spoken by a villager *

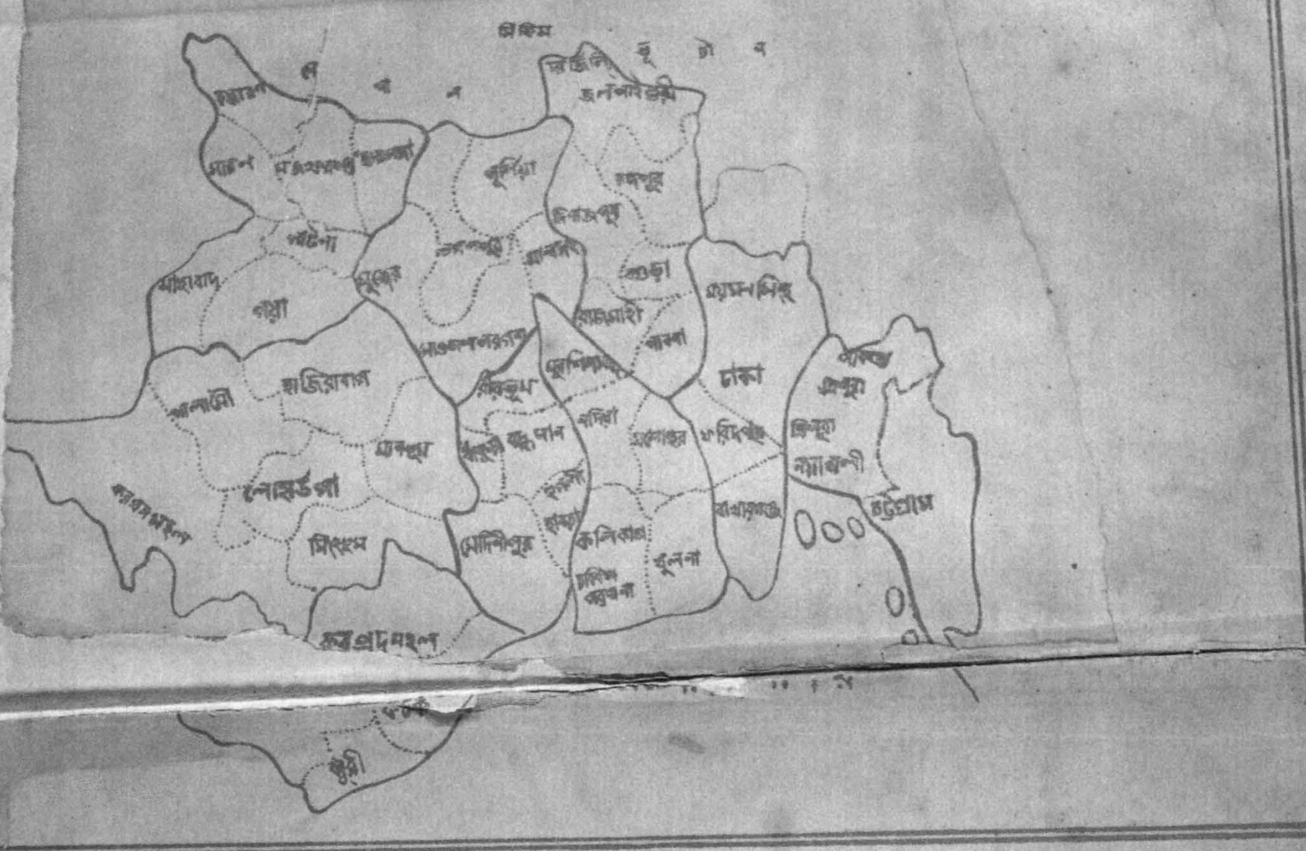
"বাঙ্গলা সাহিত্যের বাল্যসুহৃদ ও যৌবন সখা বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত রাজ নারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার বাঙ্গলা ভাষা বিষয়ক বক্তৃতার প্রথমেই লিখিয়াছেন;—'খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন-পর্য্যটক হাউএনথসঙ্গ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আসিয়া বাঙ্গলা, বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কতক অংশের একই ভাষা দেখিয়া গিয়াছেন; কেবল আসাম ও উড়িষ্যার ভাষা হইতে কিছু পৃথক্ ছিল। ইহা মাগধী-প্রাকৃত ভাষোৎপন্ন এক প্রকার পুরাতন হিন্দী ভাষা ছিল। হিন্দী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাই ঐ এক ভাষা হইতে সমুৎপন্ন তাই ইহার প্রাচীন কবিগণের ভাষা অত্যাধিক হিন্দী মিশ্রিত। বিদ্যাপতি মৈথিলী হিন্দী কবি। তাহার ভাষা না প্রকৃত হিন্দী না বাঙ্গলা পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণের দ্বারা বিদ্যাপতি রচিত কবিতা সকল বা[illegible] আকার ধারণ করিয়াছে।

আরও ভূরি ভূরি মত উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে যে বাঙ্গলা ভাষা আসামের ভাষা নহে, এবং হইতেও পারে না। আসামীরা নব্য ঐশ্বর্য্যশালী বাঙ্গলা সাহিত্যলাভের অযথা লোভবশবর্ত্তী হইয়া কখনও নিজের মাতৃভাষার বিনাশব্রতে ব্রতী হইতে পারেন না।

জনৈক আসামবাসী।

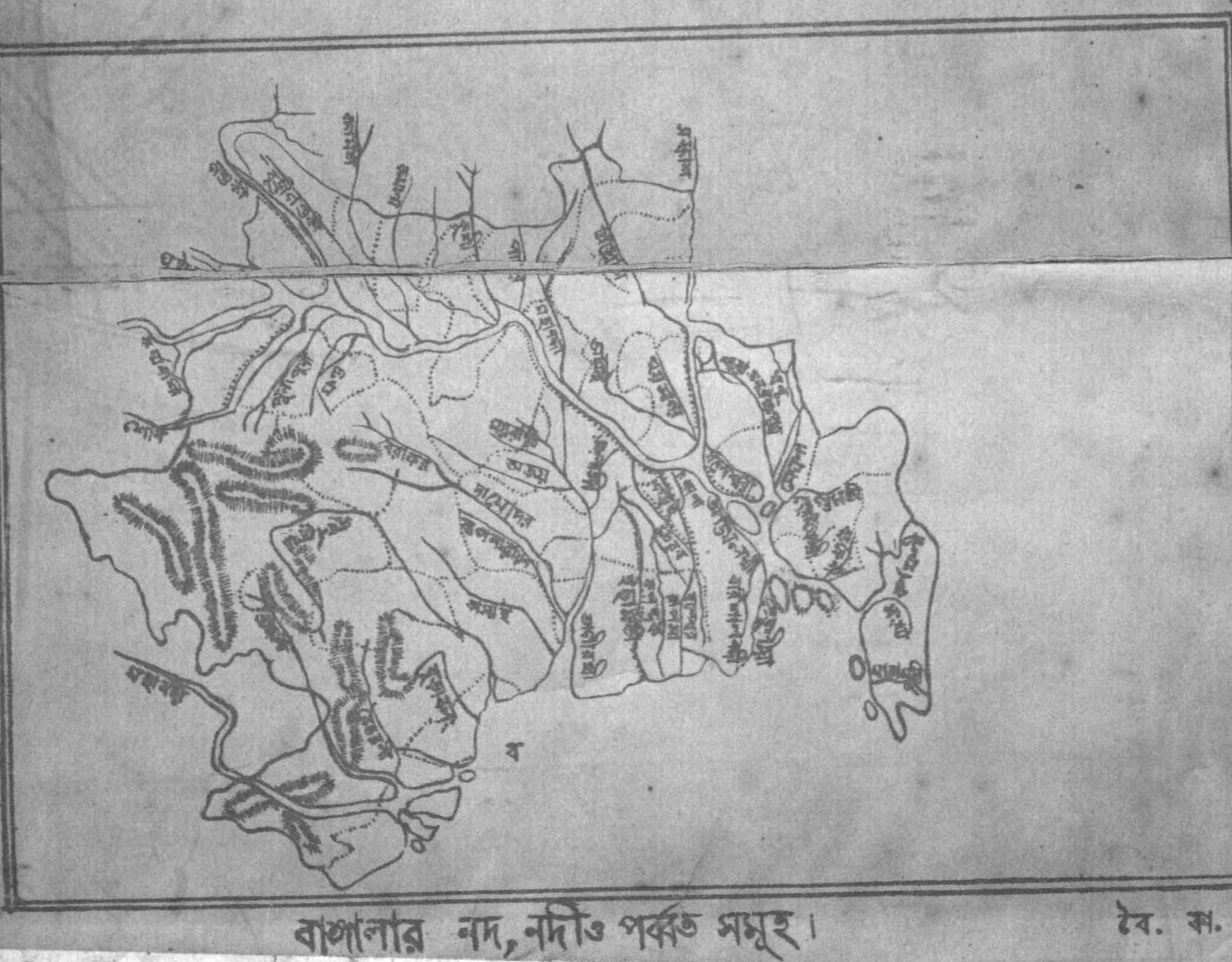
---

* A Glimpse of Assam—Edited and Published by Mrs. S. R. Ward.




বাঙ্গালার জেলা সমূহ।

বৈ. কা.



বাঙ্গালার নদ, নদী ও পর্ব্বত সমূহ।

বৈ. কা.

# কাটোয়ার বন্যা। *

## ( জলপথে কাশীযাত্রা। )

এইবার পাটুলীগ্রাম ছাড়িয়া যাইবার সময় আসিল। এতদিন এখানে বেশ সুখে কাটানো গেল, এখন কিন্তু আবার নূতন দেশ দেখিবার ইচ্ছা-টাও বড় কম নহে। পাটুলীতে আমাদের মন এমনি বসিয়া গিয়াছে যে এইস্থান ছাড়িয়া যাইতে নূতন দেশ দেখিবার আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে এক রকম কষ্টও হইতেছে। পাটুলীর সেই নির্ম্মল নীলাকাশ, সেই শুভ্র সুদূরবিস্তৃত বালুচর, দূরে সেই পল্লীগ্রামের ঘনশ্যাম ছবি আর সেই পল্লীবাসীদের সরল কথালাপ, এই সকল মনে হইলে আরো কিছুদিন সেইখানেই বাস করিয়া কাটাইতে ইচ্ছা করে। পাটুলীর সন্ধ্যামাধুরী যে দেখিয়াছে সে কখন তাহা ভুলিতে পারিবে না। সেই নির্জ্জন নদী-সৈকতে গৈরিকবসনা সন্ধ্যা-দেবী নিয়তই যেন সুগম্ভীর বেদমন্ত্র পাঠ করেন।

আজ ভোরে গ্রামের লোকেরা আমাদের কাছে বিদায় লইতে আসি-য়াছে। আমাদের মধ্যে কতকজন নৌকাতেই ছিলেন, চাসরু সকালে উঠিয়াই দুধ ও অন্যান্য জিনিষ বাজার করিয়া আনিতে গেল। এদিকে কাকীমাতার সঙ্গে আমাদের কেহ কেহ প্রতিদিনের মত আজও ভোরে উঠিয়াই গ্রামে বেড়াইতে গেলাম। আমরাও দুধ ও প্রয়োজনমত অন্যান্য যাহা কিছু পাইলাম, সঙ্গে আনিলাম। আসিয়া দেখি যে তখনও চাসরু দুধ লইয়া আসে নাই। আটটা বাজে। পিতৃদেব ষ্টীমার ছাড়িবার অনু-মতি দিতে উৎসুক। ষ্টীমারের বংশীধ্বনি দ্বারা ক্রমাগত চাসরুকে আহ্বান করা যাইতে লাগিল। অবশেষে চাসরু আসিয়া উপস্থিত—দেখিতে দেখিতে

---

* প্রথম বর্ষের পুণ্যে "জলপথে কাশীযাত্রা'র অন্তর্ভুক্ত "মঙ্গলে ঊষা বুধে পা" "ত্রিবেণীর ঝড় ও "পাটুলীগ্রাম" এই প্রবন্ধত্রয় প্রকাশিত হইয়াছে। "কাটোয়ার বন্যা" চতুর্থ প্রবন্ধ। ইহার সঙ্গে একটী সাধারণ ভাবে বঙ্গের মানচিত্র থাকা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া মান-চিত্র খানি সংযোজিত করা গেল। পরে বিশেষ ভাবে বিশেষ বিশেষ স্থানের মানচিত্র আবশ্যক মত দেওয়া যাইবে।

নোঙ্গর প্রভৃতি উঠানো হইল। খালাসীরা ষ্টীমারের সঙ্গে বজরা, পান্সী ও আরেকটা হিন্দুস্থানী 'ভড়' কাছি দ্বারা বাঁধিয়া দিল। বেগবান অশ্ব যেমন ছুটিবার পূর্ব্বে হ্রেষা রব করে, অগ্নিতেজে উত্তেজিত হইয়া ষ্টীমারও সেইরূপ এক তীব্র বংশীধ্বনি করিয়া ছাড়িয়া দিল। এপারের চেয়ে ওপারে জলের গভীরতা কিছু অধিক বলিয়া ওপার দিয়াই চলিল।

ভড় নৌকাটা সৌভাগ্যক্রমে পাটনীতে থাকিবার সময় জুটিয়া গিয়াছিল। কালনায় ছোট বোটটা ছাড়িয়া অবধি আমাদের বড় অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছিল। একটী মাত্র পান্সীতে বামুনের রান্না ও চাকর বাকরদের অবস্থান ভালরূপে চলিতে পারে না। আমাদের পাটনীতে আসিবার দিন কয়েক পরেই এই ভড়টাও কলিকাতায় মাল রাখিয়া ফিরিয়া যাইবার পথে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের মত কম জলের জন্য তাহাকেও অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। ভড়টা তাহার স্বদেশ কাশীর অভিমুখে ফিরিয়া যাইতেছিল। একদিন নদীর চরে আমরা বেড়াইতে বাহির হইয়াছি—শ্যামবাবু সঙ্গে ছিলেন—কিছুদূরে এই ভড়টাকে দেখিয়া তিনি ইহার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোরা কোথায় যাবি?' সে বলিল 'কাশী'। শ্যাম বাবু দেখিলেন এ বেশ সুবিধা হইয়াছে, তিনি ভড়ের মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আমারাও কাশী যাচ্ছি তোরা কি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবি?' তাহারা খালি নৌকা লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছিল। আমাদের সঙ্গে গেলে লাভ আছে দেখিয়া তাহারা আর দ্বিধা না করিয়া শ্যামবাবুর কথায় স্বীকার পাইল। 'কেবল কাশী পর্য্যন্ত গেলে চলিবে না আমাদের সঙ্গে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইবে' শ্যামবাবু মাঝিকে ইহাও বলিয়া দিলেন। তাহারা ইহাতেও অরাজী হইল না। স্থির হইল সর্ব্বশুদ্ধ দেড় শত টাকার ফুরণে সে কাশী পর্য্যন্ত যাইবে ও আমাদিগের সঙ্গে কলিকাতায় আসিবে। এই ভড়টাকে পাইয়া আমাদের বড় সুবিধাই হইল। ভড়টা খুব বড় ও প্রশস্ত ছিল ভিতরে অনেক খানি জায়গা। কিন্তু বাহিরে দেখিতে এমনি কদাকার ছিল যে দূর হইতে দেখিলে একটা বনশূকরের মত ঠিক দেখাইত। যেমন নাম 'ভড়' আকারও তথৈবচ। এখন থেকে চাকরেরা পান্সী ছাড়িয়া

তড়েই স্বচ্ছন্দে থাকিতে লাগিল। রামেশ্বর ঠাকুরও তাহার রান্নার সরঞ্জাম একধারে গুছাইয়া লইল। পাল্কীতে এ কয়দিন সকলের বড় কায়ক্লেশে চলিতেছিল। পাল্কীর ভাড়া ছিল রোজ দুটাকা হিসাবে।

আটটার সময় পাটনী ছাড়িলাম। ষ্টীমার নলোদ্গীরিত ধূমরাশি আকাশে পরিব্যাপ্ত করিয়া চলিল। ষ্টীমারের পার্শ্বেই বজরা খানি বাঁধা থাকাতে আমাদের বড়ই মজা হইয়াছিল। আমরা কেহ ষ্টীমারের ছাতে বসিয়া শ্যামবাবুর সঙ্গে গল্প করিতেছি, কেহ বা বজরার ভিতরে বসিয়া কত কি দৃশ্য দেখিতেছি। আবার কেহবা একবার ষ্টীমার হইতে বজরায়, আবার বজরা হইতে ষ্টীমারে ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছি। ব্র্যাকি কুকুরটীও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। বজরার একপার্শ্বে কাকাতুয়াটী দাঁড়ে দুলিতে দুলিতে 'কাকাতুয়া' নাম অভ্যাস করিতেছিল, কিন্তু যেমন ব্র্যাকি কুকুরকে দেখা অমনি রক্তাভ পক্ষচূড় ফুলাইয়া ক্রোধে স্ফীত হইয়া উঠিল। এমনি চীৎকার ও ভৎর্সনা আরম্ভ করিয়া দিল যে ব্র্যাকি সহ্য করিতে না পারিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। পাটনী হইতে আমরা যে হনুমানটীকে ধরিয়া আনিয়াছিলাম সেটীও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া মাস্তলের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। এক একবার বোধ হয় স্বদেশ স্মরণ করিয়া কাতর স্বরে ডাকিয়া উঠিতেছে।

মৃদু মৃদু বাতাসে ষ্টীমার জল কাটিতে কাটিতে চলিয়াছে। জলের স্নিগ্ধ সমীরে সকাল বেলাটী বেশ আরাম বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু বেলা যত বাড়িতে লাগিল বাতাসও যেন তত আগুন হইয়া উঠিতে লাগিল। বেলা বারটার সময় আমরা কাটোয়ার কাছে আসিয়া পড়িলাম। এক্ষণে কাটোয়া একটী সামান্য পল্লী বলিলেও চলে, কিন্তু এককালে ইহা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল বলিয়াই বোধ হয়। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে এইখানে মীর কাশিম আলির সঙ্গে ইংরাজ রাজের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল সম্ভবতঃ এই যুদ্ধে অনেক লোক কাটা পড়ে বলিয়াই ইহার নাম কাটোয়া হইয়া থাকিবে। কবি জয়দেব কেন্দুবিল্ব গ্রাম হইতে প্রত্যহ প্রায় অষ্টাদশ ক্রোশ হাঁটিয়া এই কাটোয়ার সন্নিকটে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন।

এই কাটোয়ায় অজয় আসিয়া গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। অজয়তীরে

কেন্দুবিল্ব গ্রাম থাকায় জয়দেবের সঙ্গে সঙ্গে অজয় নদও প্রখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। জয়দেব নামের সহিত অজয় নাম যেন একত্র বিজড়িত। জয়দেব অজয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবস্বরূপ বলিতে পারা যায়। এই অজয় ও গঙ্গার সঙ্গম স্থল কাটোয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একেবারে ঘাটের সামনে আমাদের আগুন-বোট লাগাইল। ঘাট হইতে খানিকটা উঁচুতে পাড়ের উপরে একটা বিশাল অশ্বত্থবৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে। তারি আশে পাশে ঝোঁপ ঝাঁপ; কোথাও আম্র-কুঞ্জ, কোথাও তালগাছের সারি, কোথাও বাবলার বন। দূরে বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত কুটিররাজির মধ্যে দুই চারিটী শৈবালাচ্ছাদিত ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ কাটোয়ার সহর ভাবের কতকটা পরিচয় দিতেছে। ঘাটের অন্য দিকটায় কেবল এঁটেল মাটীর পাড়। এটা বাজারের ঘাট। দুপুর বেলা এখন একেবারে বাতাস বন্ধ। গুমোট গরম, পথ ঘাট ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এ সময়ে গঙ্গাস্নানে আরাম আছে। আমরা ঘাট থেকে একটু তফাতে বজরা লইয়া গিয়া স্নান করিতে নামিলাম। শ্যামবাবু স্নানের বেশে অর্থাৎ তৈলচর্চ্চিত দেহে ও শিরোদেশে একখানি গামছা লইয়া বজরা হইতে নামিয়া এদিক ওদিক একটু বেড়াইতে গেলেন। কিছু পরে এক ধামা বড় বড় বাতাসা এবং কতকগুলি টোকো আম কিনিয়া আনিলেন। এখানে গঙ্গায় অনেকটা দূর পর্য্যন্ত মাত্র এক কোমর জল। আমরা সাঁতার জানিনা, তবুও সাহস করিয়া অনেকটা দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গেলাম। সাঁতারের অনুকরণে এক একবার হাত পা ছুড়িতেছি আবার কখন হয়ত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছি। গঙ্গায় জল কম ছিল বলিয়াই এত আস্ফালন। এইরূপ করিতে করিতে যতক্ষণ না শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম ততক্ষণ উঠি নাই। নিকটেই বাজারের ঘাটে লোক জনের ভিড় দেখিয়া কাকিমারা কিন্তু আজ গঙ্গাস্নানের সুখ ভোগ করিতে পাইলেন না। স্নানান্তে শুভ্র বসন পরিধান পূর্ব্বক আমরা বজরায় উঠিলে বজরা পুনরায় ঘাটের কাছে লইয়া গেল। সেই সময়ে দেখি একটী বৃদ্ধা চৌদ্দ পনের বৎসরের একটী বয়স্ক পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া স্নান করাইয়া দিতেছে। ছেলেটী হস্তপদাদি অঙ্গহীন নহে অথচ তাহার বৃদ্ধা জননীর এরূপ কষ্টের কারণ হইতেছে কেন জানিবার জন্য আমরা উৎসুক হইলাম; বৃদ্ধাকে

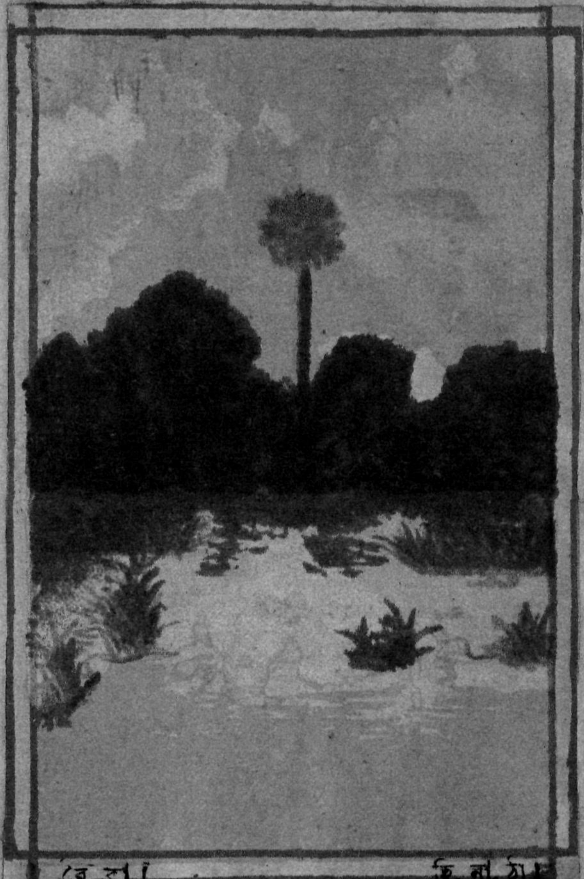


কাটোয়ায়—অজয়ের মোহানা।

জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল বালকটী এখনও পর্য্যন্ত দাঁড়াইতে পারে না। আহা সেই বৃদ্ধা জননী ছুটী পয়সা ভিক্ষার জন্য অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে দুটী পয়সার পরিবর্ত্তে দুই আনা দিলে সে আমাদিগের মঙ্গল কামনা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

সকলের স্নান সমাপ্ত হইলে যখন আমরা আজ মধ্যাহ্ন আহার করিতে বসিলাম তখন বেলা তিনটা। খাবার সময় বজরাটাকে ঘাট থেকে দূরে লইয়া যাওয়া হইল। এমন সময়ে আহারকে ঠিক মধ্যাহ্নভোজন বলা যায় কিনা সন্দেহ, কারণ তখন মধ্যাহ্ন কাল প্রায় অতীত হইয়া গেছে। কিন্তু গঙ্গার মাহাত্ম্যে আমাদের এই অবেলায় আহারেও কিছু কুফল ফলিত না। খাবার সময় আমাদের নানা বিষয়ের আলোচনা ও কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় কাকীমাতা প্রস্তাব করিলেন যে 'এখান থেকে আমরা সকলে গরুর গাড়ী করিয়া বোলপুরে গেলে ঠিক হয়।' বোলপুর একটু বেশী দূরে হয়, গরুর গাড়ীতে প্রায় তিন দিনের রাস্তা, তাই প্রস্তাবটা দাঁড়াইল শেষে এইরূপ যে, কাটোয়ার নিকটে আমাদের কোন আত্মীয়ের বাড়ী আছে সেইখানে যাওয়া যাবে। কিন্তু কল্পনা কল্পনাতেই রহিয়া গেল, কার্য্যে পরিণত হইবার অবসর পাওয়া গেল না। আমরা খাওয়া দাওয়া করিয়া উঠিলাম তখন বেলা প্রায় চারটা। একটু বিশ্রামের পর সূর্য্যদেবের অস্তগমন হইলেই বেড়াইতে যাইবার কল্পনা লইয়া ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া আছি, সহসা চোখে পড়িল রাশি রাশি মলিন ফেনপুঞ্জ ভাসিয়া আসিতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা গঙ্গার এরূপ ম্লান ফেনহাস্য দেখি নাই। খানিক পরেই দেখিলাম যে আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই পর্য্যন্ত জল বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কি কারণে এরূপ জল বাড়িতেছে আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এখানে ত জোয়ার ভাটা নাই যে এরূপ হইবে। নদীয়া পর্য্যন্ত জোয়ারের অত্যল্প বেগ থাকে। তার উপরে জোয়ারের একটু বিন্দুমাত্র প্রভাব থাকে না—একেবারে একটানা স্রোত। এমন সময়ে কালাচাঁদ মাঝি আসিয়া বলিল 'নৌকা সরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।' ঢল্ নামিয়াছে। জল ঘোর লাল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের বজরার খুঁটি যেখানটা পোঁতা ছিল জল সেই অবধি বাড়িয়া খুঁটি

ডুবাইয়া দিয়াছে। বেলা প্রায় তিনটা থেকেই আসলে জল বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা কিন্তু কেহই কিছু জানিতে পারি নাই। দেখিতে দেখিতে জল আরো বাড়িয়া উঠিল। আমাদের নৌকার দাঁড়ি মাঝিরা বড়ই ভীত হইল; আমাদের বলিল যে খুঁটি আরো দূরে না পুঁতিলে বিপদের সম্ভাবনা। দাঁড়ি মাঝিরা অবশেষে খুঁটি উঠাইয়া আরো দূরে গাড়িয়া আসিল, আর যে কাছি দিয়া নৌকা খুঁটিতে বাঁধা ছিল তাহা আরো আল্গা করিয়া দিল। আমরা যে ডাঙ্গায় নৌকা লাগাইয়া ছিলাম, সেই ডাঙ্গায় ওপার হইতে কতকগুলি কৃষক অনেকগুলি গরু নদী পার করাইয়া চরাইতে আসিয়াছিল। বেলা প্রায় চারিটার সময় তাহারা আবার গরু লইয়া ওপারে ফিরিয়া যাইবার জন্য নদীতে অবতরণ করিয়াছিল। কিন্তু তখন তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে বন্যা আসিতেছে। যখন তাহারা মাঝগঙ্গা ছাড়িয়া কিছুদূর গিয়াছে, তখন বন্যার ঘোর টানের মধ্যে গরুগুলা সব জলের উপরে নাসারন্ধ্র ও শৃঙ্গদ্বয় বাহির করিয়া সজোরে নিশ্বাস ছাড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে রাখাল বালকও সাঁতরাইয়া চলিয়াছে। যাহাতে এপার হইতে ওপারে গিয়া বন্যার নির্দয় হস্ত হইতে নিস্তার পায় এবং কোন ক্রমে গাভীগুলিকে বাঁচাইতে পারে এইজন্য তাহাদের চেষ্টা, কিন্তু হায় আমাদের চক্ষের সমুখে কত গাভী জলের স্রোতে যে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল আর দেখা গেল না। কেবল কতকগুলি মাত্র গরু লইয়া দেখিলাম রাখালেরা কিনারায় উঠিতে সমর্থ হইল—তাহাও অনেক দূরে ভাসিয়া গিয়া। দুএকটী দেশী কুকুরও দেখিলাম এপার থেকে ভাসিয়া ধীরে ধীরে সাঁতার কাটিতে কাটিতে ওপারে চলিয়া গেল। গঙ্গার জল যেন রোষ ভরে ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে কেবল ফেনপুঞ্জ রাশি রাশি ভাসিয়া বেড়াইতেছে। দেখিলেই বুঝা যায় একটা কিছু বিষম ব্যাপার ঘটিবে। আকাশের মেঘেরা যেন কি এক অবসন্ন ভাবে বিরাজ করিতেছে। পশু মনুষ্য সকলেই সন্ত্রস্ত। আমাদের বজরা যেখানটায় ছিল সেখানটা অজয়ের মোহানার কাছে। সকলেই বলিল অজয়ের বন্যা নামিয়াছে। সেখানকার দুএকজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম 'সহসা এ রকম জল বাড়িল কেন?' তাহারা বলিল 'বাবু মহাশয় এখানে




পথের দৃশ্য।

এমনিই হঠাৎ হঠাৎ অজয়ের জল বেড়ে ওঠে। এই জল নেই, হয়ত পরক্ষণে একেবারে জল বেড়ে উঠে বানে সমস্তই ডুবিয়ে নিয়ে যায়।' ভড়ের হিন্দুস্থানী মাঝিটা পাকা ছিল, সে এ পথে অনেকবার আসা যাওয়া করিয়াছে, সে আমাদিগের সকলকে সাবধান করিয়া দিল যে যদি আমরা এস্থানে আর অধিকক্ষণ থাকি তবে বিপদের বিশেষ সম্ভাবনা। তাই তাহার কথামত পিতৃদেব বজরা ছাড়িয়া একটু দূরে গিয়া বজরা নঙ্গর করিতে আদেশ করিলেন। ভড়ের মাঝি ও ষ্টীমারের সারেঙ্গ অনতিদূরে একটী স্থান মনোনীত করিল। দাঁড়ি মাঝিরা সকলেই বলিতে লাগিল যে এ জায়গাটা কতকটা নিরাপদ হওয়া সম্ভব কিন্তু একেবারে যে কোনই আশঙ্কা নাই তাহা বলা যায় না। কারণ বন্যার বেগ কোথায় কিরূপ ভাব ধারণ করিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না।

এক্ষণে সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে; আমরা একবার তীরে নামিয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলাম। অদূরে দেখি এক উচ্চ ভূমির পার্শ্ব দিয়া কল কল স্রোতে জলধারা প্রবাহিত হইয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়িতেছে। ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া এই স্থানেই আজ অবস্থান করা গেল। সাবধানতার সহিত উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া নোঙ্গর প্রভৃতি ফেলা গেল। এই বন্যার মাঝে রাত্রিতে ষ্টীমারের পক্ষে চলাও বিপজ্জনক। রাত্রিতে কি হয় বলা যায় না। হয়ত বা বন্যার তোড় আসিয়া এই চারিটী নৌকাকে সমূলে বিনাশ করিতে পারে। আজ রাত্রে কাহারই খাওয়া দাওয়া ভাল হইল না, সব একটু একটু দুধ খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। ভাবনায় অবসাদে এমনি ঘুমাইয়া পড়িলাম যে একেবারে এক ঘুমে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রাতঃকালে এখানকার লোকে বলিল যে, গতকল্য অজয়ের ভীষণ বন্যা আসিয়া অনেক গ্রাম ও বিস্তর নৌকাদি ডুবাইয়া লইয়া গিয়াছে। ভাগ্যে আমরা নৌকা এখানে লাগাইয়াছিলাম তাই রক্ষা। এই অজয় নদী বর্ষাকালে বাস্তবিকই ভীষণ আকার ধারণ করে। বন্যার সময় ইহার অজেয় বলের কাছে যেন কেহই দাঁড়াইতে পারে না। এই হিসাবে অজয়ের সহিত জয়দেবের গীতগোবিন্দের কতকটা সাদৃশ্য আছে বোধ হয়। গীতগোবিন্দ একটী অতি ক্ষীণ গীতিকাব্য

হইয়াও তাহার মাধুর্য্য রসে যেরূপ জগতে বন্যা আনয়ন করিয়াছে তাহা বিস্ময়জনক। কিন্তু অজয়ের ন্যায় গীতগোবিন্দের প্লাবন ধ্বংসকারী নহে। যাহাই হউক পরদিন সকালে গত কল্যের ব্যাপার সকলই স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল।

---

# দেবপূজা ও যজ্ঞের উৎপত্তি।

স্বভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই মাতৃস্তন্যপানে পরিপুষ্ট হয়। দেখা যায় এই স্বাভাবিক নিয়ম মানব জাতির শৈশবাবস্থাতেও কার্য্য করিয়াছে; মানব জাতিও অতি শৈশবে প্রকৃতিপালিত শিশু ছিল, প্রকৃতির স্তন্যরূপ ফল মূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিত। শৈশবাবস্থায় প্রকৃতিদত্ত ক্ষুধা বা আহারেচ্ছাই মানবকে প্রধানতঃ উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। এই আদিমকালে মানবকে কে দেখিত? কে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে? স্বয়ং পরমেশ্বর পিতার ন্যায় ও প্রকৃতি দেবী স্নেহময়ী জননীর ন্যায় স্বহস্তে লালনপালন করিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির ক্রোড় ত্যাগ করিয়া মানব যতই স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে শিখিল, ততই তাহার অন্তর্নিহিত ধীশক্তিও ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া জগতের বিষয় জানিবার জন্য উৎসুক হইল। মানব সভ্যতার সেই প্রাকাল ব্রহ্মমুহূর্ত্তের ন্যায় অতি পবিত্র কাল। সেই উষাকালে প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহ ধরণীর প্রথম সন্তানদিগের হৃদয়ে না জানি কত নব নব ভাব উদ্দীপিত করিয়াছিল। ইহা বৈদিক যুগেরও পূর্ব্বকালের কথা। এই অতি আদিম কালে হয়ত মানবের ভালরূপ বাক্যস্ফুট হয় নাই। ভূ কিম্বা ওঁ ইহারি অনুরূপ অস্ফুট দুই চারিটী একাক্ষর শব্দে ভাব ব্যক্ত করিত। শিশুর ন্যায় নির্ব্বাক ধ্যানমগ্নের অবস্থা সে সময়ের সহজ ভাব। ইহা মরীচি, কশ্যপ প্রভৃতি

প্রজাপতি ঋষিদিগের বয়স্কার কথা বলিতেছি। এই প্রজা সৃষ্টির সময়ে মানবসমাজ প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির সূতিকাগৃহে অবস্থিতি করিতেছিল বলা যাইতে পারে। * মহাভারতাদি প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থের সাহায্যে জানা যায় যে এই কশ্যপপ্রভৃতি প্রজাপতিগণই দেব দানব উরগ যক্ষ রক্ষ প্রভৃতি নানা জাতীয় মানবের উৎপত্তির মূলে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে আজকাল পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্য জাতিকে, ককেশিয়, মোঙ্গোলিয় প্রভৃতি তিন চারিটী ভাগে বিভক্ত করেন, ইহাদিগের সকলেরই মূলে কশ্যপ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ। কেবল দেশ, অবস্থা ও আচারভেদে আর্য্য অনার্য্যের মধ্যে প্রভেদ কালে এতটা বদ্ধমূল হইয়া গেছে, নহিলে কশ্যপ প্রভৃতি প্রজাপতিরূপ বীজ হইতে আর্য্য অনার্য্য প্রভৃতি নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত সুবিশাল মানব বৃক্ষের উৎপত্তি। এ সকল প্রমাণ সহকারে "মানব জাতিতত্ত্বে" সবিশেষ আলোচনা করা গিয়াছে। এ প্রবন্ধ সে সকলের বিস্তৃত আলোচনার স্থান নহে। প্রকৃত পক্ষে এক্ষণে যাহারা এক একটী প্রধান জাতিরূপে পরিণত এককালে তাহারা জ্ঞাতি সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিল। জ্ঞাতিবিরোধই ক্রমে বিশালতা প্রাপ্ত হইয়া অনেকস্থলে জাতিবিরোধ বা জাতিশত্রুতায় পরিণত হইয়াছে। এই আদিম প্রজাপতি ঋষিগণ হইতে নানা জাতীয় মানব উৎপন্ন হইলেও উহাদিগের মধ্যে প্রথমে দেবতারাই জ্ঞানে বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে ও ধীশক্তিতে সর্ব্ববিষয়ে অন্যান্য শাখা বা জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। দৈত্য দানব প্রভৃতি অন্যান্য জাতিগণ জ্ঞানচর্চ্চায় উন্নত না হইয়া কেবল অধিক মাত্রায় হিংসা কাম ও ক্রোধ প্রভৃতি ব্যসনে আসক্ত হইয়া দেবতাদিগের সহিত শত্রুতা আচরণ করিত। ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইতে দেবতারা সভ্যতার উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিতে লাগিলেন আর দৈত্য দানবেরা অবনতির ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হইল।

---

* মরীচি, কশ্যপ প্রজাপতিগণেরও মূলে জগতের আদিপুরুষ ব্রহ্মা। ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের সংযোগে ইঁহার সৃষ্টি হয় নাই। ইনি ঈশ্বরসৃষ্ট আদিপুরুষ বা প্রথম জাত মনুষ্য। তাই ব্রহ্মা সৃষ্টিশক্তিরূপে কল্পিত হয়েন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আদিমকালে আহারেচ্ছাই মানবকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছে। এই আহারেচ্ছাটা কি না প্রকৃতপক্ষে আহরণেচ্ছা। প্রথম হইতেই মানব আত্মরক্ষার জন্য প্রকৃতি হইতে নানা বিষয় আহ-রণ করিতেছে। সকল প্রকার আহরণের মূল হেতুই আত্মরক্ষা। এই আত্মরক্ষার ভাব যদি ঈশ্বর না দিতেন তাহা হইলে কেহই কোনরূপ আহরণ কার্য্যে নিযুক্ত হইত না। কিন্তু এই আত্মরক্ষার ইচ্ছা নীরসভাবে সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর, কারণ আত্মরক্ষারূপ ভাবের প্রেরয়িতা পরমেশ্বর স্বয়ং রসস্বরূপ—রসো বৈ সঃ। সেই হেতু আত্মরক্ষার একটী বিশেষ উপাদান রসাহরণ। এই রসের আনন্দের জন্য মানব আহারের উৎকর্ষ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। এই রসের আনন্দের জন্যই দেবতারা সে কালে ক্রমে ধীশক্তি ও জ্ঞানবলে নানাবিধ সুস্বাদু মানবোপযোগী খাদ্য আবিষ্কার করিতে লাগিলেন; কোনটী খাইতে সুস্বাদু ও কোনটী খাইলে বিশেষ বলাধান ও পুষ্টিলাভ হয় সেই সকল নির্ব্বাচন করিয়া ফল মূলের রসাস্বাদে পরিতৃপ্ত হইতেন। যেমন সোমলতার নানাপুষ্টিকর গুণ থাকায় সে সময়ে সোমরস দেবতাদিগের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। গো-ছাগ প্রভৃতি পশুগণকেও, আহারের জন্য তাঁহারা পালন করিতে লাগিলেন। গোদুগ্ধ খাদ্যরূপে প্রচলিত হইল। দুগ্ধসার হবি প্রস্তুত প্রণালীও উদ্ভাবিত হইল। যে ঘৃতের জন্য মনুষ্য আজ কৃতার্থ। যাহার সাহায্য বিনা কি আমিষ কি নিরামিষ কোন প্রকার খাদ্যই সুসিদ্ধ হয় না সেই ঘৃত জগতে প্রথম প্রচলিত করেন দেবতারা। হবি দেবগণের প্রাণের প্রিয় জিনিষ ছিল। দেবতারা এই যে হবি মানবের খাদ্যরূপে প্রচলন করিয়া গেলেন তাহা এ পর্য্যন্ত খাদ্য-খাকে সর্ব্বপ্রধান আসন গ্রহণ করিয়া আছে। কাম ক্রোধাদি রিপুগণের বশীভূত অসুরেরা কিন্তু হিংস্র স্বভাবের কারণে মাংসাশী হইয়া উঠিল। সে সময়ে মহাবল অসুরেরা মাংসাদি ঘৃতাদির দ্বারা পরিপাক করিবার অপেক্ষা রাখিত না, তাই তাহারা সচরাচর অসভ্যদিগের ন্যায় আম মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। দেবাসুরের মধ্যে বিরোধী-ভাবের সঙ্গে বিরোধী আহারের সূত্রপাত হইল। পিশাচ অসুরেরা আম-মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করিত আর উন্নত হৃদয় দেবতারা দুগ্ধ সোমরস,

ঘৃত ও বৃক্ষফল প্রভৃতি অমৃতোপম নিরামিষ আহারে প্রধানতঃ জীবন ধারণ করিতেন।

দেবযুগে মানবসভ্যতার প্রথম সোপান প্রস্তুত হইয়াছিল। তৎপরে জগতে আরেক নবযুগ আসিয়া দেখা দিল। দেবযুগের পরে ঋষিযুগের প্রাদুর্ভাব। দেবযুগে মানব, প্রকৃতির ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় ছিল। মাতৃ-ক্রোড়ে থাকিয়া শিশুরা যেমন সহজভাবে ক্রীড়া করে সেইরূপ মানব সমাজের শৈশবাবস্থায় দেবতারা (দ্যুতিশীল মনুষ্যেরা) প্রকৃতির ক্রোড়ে থাকিয়া প্রকৃতির শিশুর ন্যায় সহজ ভাবে ক্রীড়া করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত দিব ধাতুর অর্থই ক্রীড়া করা।

দিব্যতে ক্রীড়তে যস্মাত্তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ।

প্রকৃতির শিশু দেবতাদিগের এই সহজভাবের জন্য দেবতাদিগের 'লীলাখেলার' কথা লোকে প্রসিদ্ধ। আত্মার ক্রীড়াশীলতাই দেবগণের দ্যুতিশীলতার প্রধান কারণ। ক্রীড়াশীলতার অভাবে অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য হইলে আত্মা নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। ক্রীড়াশীলতা ও দ্যুতিশীলতা এই দুই ভাবই দেবত্বের মধ্যে বিদ্যমান। দেবযুগের পরে যে নবযুগ উহাই বেদ-যুগ বা বৈদিক ঋষিদিগের যুগ। এ যুগে মানব সমাজ শৈশবাবস্থা হইতে বাল্যে পদার্পণ করিয়াছে। এ যুগে মানব বাক্যের দ্বারা মনোভাব পরিস্ফুট করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই ঋষিযুগে দেবযুগের ন্যায় লোকে আর সে সহজভাবে ক্রীড়া করিতে পারিল না। কিন্তু শিশু যেমন বাল্যে পদার্পণ করিলে বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করে সেইরূপ এ যুগে লোকে জ্ঞানার্জ্জন বা বিদ্যাচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইল। দেবযুগের ধাতু 'দিব'র পরিবর্ত্তে ঋষিযুগের ধাতু 'বিদ' ('বিদ ল জ্ঞানে') হইল। বৈদিক ঋষিরা দেবভক্ত ছিলেন। দেবতারা যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা মানবসমাজকে আলোকিত করিয়া গেলেন ঋষিরা তজ্জন্য ভক্তিভরে নানা ছন্দে অমৃতভাষী বালকদিগের ন্যায় ঋজু ভাষায় দেবগণের মহিমা গান করিয়া ঋক সমূহ রচনা করিলেন। ভক্তের স্তবে কোথাও বা রঞ্জিতও হইয়াছে কোথাও বা ভাবের সমাবেশে প্রকৃত বিষয় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। তাই এক্ষণে বহু সহস্র বর্ষ পরে বেদ-সূক্তগুলি দূর হইতে আমাদিগের নিকট প্রাকৃতিক দৃশ্যের ন্যায় প্রতিভাত

হয়। বস্তুতঃ বেদের ইতিহাসাংশ কবিত্বে রঞ্জিত হইয়া সুন্দর আকার ধারণ করিয়াছে।

যে দেবগণের স্তুতিগানে বেদের এত মাহাত্ম্য সেই দেবতারা অদিতির সন্তান। কশ্যপ ভার্য্যা অদিতির দ্বাদশ তনয় হইতেছে দ্বাদশ আদিত্য। আদিত্য হইতেছে অদিতির তনয় বলিয়া। দ্বাদশ আদিত্য কাহারা? মহাভারতের আদি পর্ব্বে স্পষ্টই লিখিত আছে—"প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষ কন্যা অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য জন্মিয়াছেন। হে রাজন! তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম কীর্ত্তন করিতেছি যথা;—ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শত্রু, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। এই দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান।" ঋগ্বেদের দেবগণের বিষয় এত স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইলেও আমরা কেন যে তাহা একবার চক্ষু মেলিয়া দেখি না ইহাই আশ্চর্য্য। দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু "সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান" বলিয়াই 'বিষ্ণু' পরবর্ত্তী কালে ঈশ্বরের অবতার রূপে কল্পিত হইয়াছেন ইহা বুঝা যায়। *

পূষা, শত্রু প্রভৃতি অদিতি তনয় এই দ্বাদশ আদি দেবগণের স্তুতিতেই দেখা যায় ঋগ্বেদের অধিকাংশ ধ্বনিত। ঋগ্বেদের কোথাওবা বিবস্বান দেব তপনচ্ছটায় দীপ্তি পাইতেছেন, কোথাওবা বিশাল হৃদয় শুভ্রকান্তি (প্রচেতা) বরুণদেব সন্তাপহারী সলিল রাশির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন, কোথাওবা বজ্রবিদ্যুদ্ধারী মহাশক্তিশালী শত্রু দেবরাজরূপে শোভা পাইতেছেন। ঋগ্বেদে এ সকলি বর্ণিত হইয়াছে।

---

* পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক কিছুদিন হইল ব্রাহ্মসমাজ কমিটির অধিবেশনে "বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাত এবং সংঘাত" নামক প্রবন্ধ প্রপঠিত হয়, তাহাতে তিনি ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবগণকে "প্রাকৃতিক প্রতিভাস" স্বরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সাধারণতঃ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণেরও মত। এই য়ুরোপীয় মত লইয়া প্রায় ভারতবাসীরাও সকলে রোমন্থন করিয়া থাকেন, কিন্তু একটু মন্থন করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় বেদোক্ত ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ "প্রাকৃতিক প্রতিভাস" মাত্র নহে। ঋগ্বেদ বাস্তবিক ভারতের দেবগণের অর্থাৎ অতি আদিমকালের জ্যোতিষ্মান সমুন্নত মানবের ইতিহাস।

ঋষিরা ঋগ্বেদে দেবগণের উদ্দেশে শুদ্ধ ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি স্বরূপে এই স্তবগুলি লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা পূজ্যপাদ দেবতাদিগের উদ্দেশে তাঁহাদের ঘৃতাদি প্রিয় বস্তুও উৎসর্গ না করিয়া তৃপ্ত হইতেন না। লোকান্তরিত পূজ্য ব্যক্তির উদ্দেশে তদীয় প্রিয়বস্তু উৎসর্গ করা স্বাভাবিক, তাই দেবযুগের পরবর্ত্তী কালে দেবভক্ত ঋষিরা অমরত্ব প্রাপ্ত দেবগণের প্রিয়বস্তু হবি প্রভৃতি উৎসর্গ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ভক্তিপূর্ব্বক দেবতাদিগের উদ্দেশে এই হবি প্রভৃতি উৎসর্গের নামই আমরা এক কথায় দেবপূজা বলিতে পারি। দেবভক্তির নামই দেবপূজা। দেবপূজা বলিতে কল্পনায় দেবতার তুষ্টিসাধন। ইহা ঈশ্বরোপাসনার সমান আসন গ্রহণ করিতে পারে না। যেমন আমরা কোন পরলোকগত পূজ্য ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা বা ভক্তি করিয়া তাঁহার নামে কোন দ্রব্য উৎসর্গ করি, বৈদিককালে ঋষিদিগের দেবপূজার কারণে হবি উৎসর্গেও সেইরূপ। এই দেবপূজা হইতেই যজ্ঞের উৎপত্তি। ভক্তি সহকারে দেবতার উদ্দেশে হবি উৎসর্গ হইতেই যজ্ঞের আবির্ভাব। ঋষিরা দেবতাদিগের নামে যে হবি উৎসর্গ করিবেন, তাহা কি উপায়ে করিবেন? এই ভাবিয়া ঋষিরা তেজঃপূর্ণ অগ্নির সাহায্য লইলেন। মনুষ্য "ঊর্দ্ধমূল" তাহার মনের গতি স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধদিকে। দেবতারা অন্তর্হিত হইয়াছেন ঋষিদিগের মনে প্রশ্নের উদয় হইল, কোথায় গিয়াছেন, উত্তর পাইলেন ঊর্দ্ধে। এই কারণে ঋষিরা দেবগণকে স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দেবতারা যে ঊর্দ্ধে অবস্থিত করিতেছেন ঋষিদিগের মনে তাহা আরও এক কারণে উদয় হইতে পারে। দেবতারা উচ্চভূমি হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহে বাস করিতেন আর পরবর্ত্তী বৈদিক যুগের ঋষিরা মর্ত্তভূমি ভারতের নিম্ন আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসী ছিলেন। হিমালয় অঞ্চলের স্বাস্থ্যকর পার্ব্বত্য প্রদেশের এক নামই স্বর্গ বা অমর ধাম ছিল আর মারী মরকাক্রান্ত ভারতের নিম্নভূমি আর্য্যাবর্ত্তের নাম মর্ত্তভূমি ছিল। জর্ম্মণ ভাষায় "হিম্মেল" (himmel) শব্দের অর্থই স্বর্গ। "হিমেল" যে "হিমালয়" শব্দের সংক্ষেপ তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, ভাষার সাদৃশ্যবশতঃ ইহা সহজেই বুঝা যায়। হিমালয়ের ঊর্দ্ধে দেবগণের অবস্থানই যে ঋষিদিগের পূর্ব্বোক্ত কল্পনার বিশেষ সহায়তা

করিয়াছে তাহা বোধ হয়। স্বর্গস্থ দেবতাদিগের উদ্দেশে যে ঘৃত উৎসর্গ করা হইতেছে তাহাকেও ঊর্দ্ধে প্রেরণ করা চাই। কি উপায়ে হবি প্রেরিত হইবে? ঊর্দ্ধশিখ দীপ্তিমান অগ্নিকে উপযুক্ত ভাবিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ঋষিরা অগ্নিতে ঘৃতের আহুতি দিতেন কারণ অগ্নিই ঘৃতকে ঊর্দ্ধে পরিব্যাপ্ত করিত; তাঁহারা ভক্তিভরে কল্পনা করিয়া লইতেন যে অগ্নি দ্বারা ঊর্দ্ধপ্রেরিত ঘৃত স্বর্গস্থ দেবতাঁরা ভোগ করিয়া তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাদের হবনও সার্থক হইয়াছে। এইরূপে বৈদিক ঋষিদিগের দ্বারা দেব-পূজার কারণে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির প্রচলন হইল। ইহা হইতেই যজ্ঞের সূত্রপাত। ইহাই ক্রমশঃ শাখাপ্রশাখায় বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে। একালে যেমন পরলোকগত মহাত্মাগণের স্মরণার্থে মহাধূম সহকারে সভাসমিতি আহূত হয়, বৈদিক কালে সেইরূপ ঋষিদিগের কর্তৃক দেবগণের জন্য মহা-ধূম সহকারে যজ্ঞে হবি আহুত হইত। ইহা ঋষিদিগের অনুষ্ঠানের একটী বিশেষ অঙ্গ ছিল। ইহারি জন্য বন হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইত পরে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি জ্বালাইতে হইত, এবং দুগ্ধসার হবি প্রস্তুত করিয়া সেই অগ্নিতেই আহুতি দিতে হইত। প্রাণের সহিত যে কর্ম্ম করা যায় তাহার সুফল আছেই। সরল প্রাণ ঋষিরা দেখিলেন তাঁহাদিগের হবি উৎসর্গের ফলে সুবৃষ্টি হইতেছে। তাঁহাদিগের মনে হইল যে দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন তাহারি ফলে এই সুবৃষ্টি হইতেছে, শস্য ভাল হইতেছে। ক্রমশঃ তাঁহারা সিদ্ধান্তে আসিলেন যে অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ সুবৃষ্টি করিবার এক মন্দ উপায় নয়। ঘৃতধূম আকাশে ছড়াইয়া মেঘের কারণ হয় এবং ঘৃতসম্পৃক্ত বৃষ্টিজলও অনেক পরিমাণে শস্যবর্দ্ধক হয়। যখন সেকালের বিজ্ঞানে ঘৃতাহুতির এই সফলতা প্রতিপন্ন হইল তখনি ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত হইল। সর্ব্বসাধারণে ঘরে ঘরে হোম করিতে লাগিল। তখনি মনু এই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিতে পারিলেন।

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে সূর্য্যের উপস্থান হয়, সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইলে শস্য জন্মে, এবং শস্য হইতে প্রজা উৎপাদিত হয়

দেখে ঋষিদিগের সেই দেবভক্তির কারণে হবি উৎসর্গ হইতে কত শুভ ফল ফলিল। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াইল। শুভকর্ম্ম এমনি জিনিষ যে একটী শুভকর্ম্মের বীজ আরম্ভ করিলেই শত শত আনুসঙ্গিক শুভফল আসিয়া পড়ে। দেখ ঋষিরা দেবতাদিগের তুষ্টি করিতে গিয়া দেখেন যে হোমটা সুবৃষ্টির এক উপায়। হোমের শুভফল এখানেই পর্য্যবসিত হইল না; হোমের জন্ত কাষ্ঠাদি আহরণ করিতে গিয়া ভারতের কত বনজ ফলমূলও আবিষ্কৃত হইল এবং অগ্নিসংযোগে ঋষি সভায় তাহাদের গুণাগুণ পরীক্ষিত হইবার এক পথ হইল। এইরূপে যজ্ঞের ফলে মানবের কোন্‌টা আহার্য্য কোন্‌টা বা আহার্য্য নয় তাহাও এই সঙ্গে ক্রমে অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারা আর্য্য ঋষিদিগের কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইতে চলিল।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

## গ্রন্থ সমালোচনা।

ছায়াপথ—

শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত প্রণীত। এই কবিতা পুস্তকটী বাস্তবিকই ছায়াপথ নামের উপযোগী হইয়াছে। নিশীথাকাশে ছায়াপথের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিলে যেমন প্রাণ স্বপ্নে নিমগ্ন হয় সেইরূপ এই ছায়াপথ নামক কবিতা পুস্তকটীও আমাদের অন্তরে স্বপ্নছায়া সৃজন করে। এই ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকটীর অধিকাংশ সনেটে পরিপূর্ণ। অনেকগুলি গানও ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। সনেটের মধুর স্বনন বড়ই শ্রুতি সুখকর। ছায়াপথের দুএকটী কবিতা উদ্ধৃত করিলেই পাঠক ইহার কবিত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

ছোট।

এ জগতে আমি যত ছোট ভালবাসি।
ছোট মুখ, ছোট কথা, ছোট ছোট হাসি!
সংসার নন্দন বনে ওই ছোট সুখ।
চিরদিন তুর মোর জুড়ায়েছে বুক!

দুঃখীর কম্পিতাধরে ওই ছোট কথা
শুনিলে জীবন যেন কত পায় ব্যথা;
ওই ছোট হাসি মুখ হৃদয়ে আমার
যেন পূর্ণ মন্দাকিনী বহে অনিবার!
আমার নয়নে চির রহিয়াছে ফুটি,
এ আমার ছোট গান ছোট ফুলগুলি,
নিতি নিতি গাই, আমি নিতি নিতি তুলি,
ছোটতে কেমন যেন মুগধ পরাণ
আমি ছোট বলে তাই ছোটতে এ টান।

"গীতোচ্ছাস" প্রভৃতি কবিতা গুলি যদি ওরূপ ব্রজবুলির ছাঁদে না লিখিয়া খাঁটি বাঙ্গলায় লেখা হইত তাহা হইলে বরঞ্চ ভালই শুনাইত; ব্রজভাষায় লিখিত হওয়াতে কবিতা গুলির মধ্যে বড়ই কৃত্রিমতা প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রজবুলির সে স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক জীবন্ত মাধুরী নাই। ছায়া-পথের কোন কোন কবিতা ও গান কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিগণের ছায়া বা প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই দেখা যাইতেছে। নিম্নে এই-রূপ একটী কবিতা হইতে একটু খানি উদ্ধৃত করা গেল।

সিন্ধু মিশ্র।
(সখি) কে এ ভিখারী।
যোগীবেশে, আধ হেসে, কি চায় বুঝিতে নারি। ইত্যাদি

উপরোক্ত গানটী কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি রচিত নিম্নলিখিত গানটীর কিরণ পাইয়া যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে বোধ হয়।

সখি আমারি দুয়ারে কেন আইল
নিশি ভোরে যোগী ভিখারী। ইত্যাদি

মোটের উপর ছায়াপথের কবিতারূপ পুঞ্জীভূত নক্ষত্র সমূহ হৃদয়াকাশে স্বপ্নময় স্নিগ্ধ আলোক প্রদান করে।

স্থানাভাবে এবারে অন্যান্য পত্র ও পুস্তকাদির সমালোচনা যাইতে পারিল না, তজ্জন্য গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

# পুণ্য।

## নব্যবঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত।

ভারতবর্ষে নব্যতন্ত্রের স্ত্রীশিক্ষার মূলে যে বঙ্গদেশে তাহার প্রচলন, ইহা বোধ হয় এক প্রকার সর্ব্ববাদসম্মত। কিন্তু বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীশিক্ষা এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে একটীকে ছাড়িয়া অপরটীর বিষয় উল্লেখ করিলে গুরুতর অঙ্গহানি হইয়া পড়ে। কেবল তাহাই নহে, ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ই প্রত্যেক রমণীর যে বিদ্যাশিক্ষা কর্ত্তব্য, এই কথার প্রথম সূত্র ধরাইয়া দেন। ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীশিক্ষার বিষয় বলিতে গিয়া ইতিহাসের সম্মান রক্ষার জন্য, সত্যের অধিকার রক্ষার জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাকে ব্যক্তিগত অনেক কথা বলিতে হইবে, পাঠকগণের নিকট বিনীত অনুরোধ, তাহাতে তাঁহারা যেন আমার প্রতি পক্ষপাত প্রভৃতি অথবা দোষারোপ না করেন। একটা কোন নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেই লোকে তাহার প্রতিষ্ঠাতা অথবা প্রধান প্রধান সভ্যদিগের কার্য্য সমূহকে সমাজেরই কার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ে আলোচনা করেন এবং বাস্তবিকও এরূপভাবে আলোচনা ভিন্ন একটা সমাজের কার্য্যনির্দ্দেশও অসম্ভব হইয়া পড়ে। সচরাচর প্রতিভাসম্পন্ন প্রধান ব্যক্তিরাই বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বসাধারণে তাহাতে সায় দিয়া, তাহা অবলম্বন করিয়া তাহার পরিধি বিস্তৃত করিয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। ব্রাহ্মসমাজের বিষয় বলিতে গেলেই

রাজা রামমোহন রায়, যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, বাগ্মীবর ৺কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি প্রধান প্রধান সভ্যেরা কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহারই প্রধানতঃ উল্লেখ করা যায়। ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীশিক্ষার বিষয় বলিতে গেলেও ঐ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বোক্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধনে যে বিশেষ সহানুভূতি ছিল, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু তিনি তাঁহার "সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক সম্বাদে" স্ত্রীশিক্ষার সূত্র ধরাইয়া দিলেও তদ্বিষয়ে কোনরূপ প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোন গ্রন্থে এবিষয়ের উল্লেখ অথবা এরূপ গভীর বিষয়ক কোন গ্রন্থই দৃষ্ট হয় না। আজকাল যে স্ত্রীশিক্ষার প্রস্তাব আলোচিত হইলেই কথায় কথায় লীলাবতী প্রভৃতি বিদুষী রমণীর উল্লেখ করা হয়, রামমোহন রায়ই তাহার মূল। যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে অল্পবুদ্ধি বলিয়া বিদ্যাশিক্ষা দিবার বিরোধী হয়েন, তাঁহাদিগের প্রতিবাদে রামমোহন রায় তাঁহার সহমরণ বিষয়ক উক্ত প্রস্তাবে সুগভীর মনস্বিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতেছেন—"প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে কোন ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাটরাজার পত্নী, কালীদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাতা আছে, বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছিলেন, মৈত্রেয়ীও তাহা গ্রহণপূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।" উপরি উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে রামমোহন রায় বিস্তৃত অর্থে স্ত্রীশিক্ষার কিরূপ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্ত্রীলোকের ধর্ম্মভাব প্রভৃতিও সুন্দর যুক্তির সহিত সমর্থন করিয়াছেন। মূলত যুক্তির

উপর নির্ভর করিয়া স্ত্রীশিক্ষার এইরূপ সমর্থন করা ব্রাহ্মসমাজে আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। রামমোহন রায় সহমরণবিষয়ক উক্ত প্রস্তাব ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন, সুতরাং বর্ত্তমান যুগে তাঁহার পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষার কথা কোন বঙ্গবাসীই উত্থাপন করেন নাই এবং ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার সেই উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিয়া বিস্তৃতভাবে প্রচার করিয়াছেন বলিয়া বঙ্গের প্রত্যেক কন্যার পিতা, প্রত্যেক স্ত্রীর স্বামী এবং প্রত্যেক জননীর পুত্রের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিয়া নমস্কার করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত বিষয়ে অবশ্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। তাঁহারাই স্ত্রীবিদ্যালয় খুলিবার প্রথম পথ-প্রদর্শক। তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করাইবার মূল উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়াই স্ত্রীবিদ্যালয় খুলিলেও আমাদের ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কোন বঙ্গবাসীই এবিষয়ে কার্য্যক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ হয়েন নাই। কে জানিত যে তাঁহারা এই অনুষ্ঠানে প্রথম হস্তক্ষেপ না করিলে আজ স্ত্রীশিক্ষা এত বিস্তৃত হইত কিনা—স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাতই হইত কিনা বলা কঠিন। একটা কিছু আদর্শ হাতের নিকটে পাইলে তাহাকে নিজের মনোমত করিয়া গড়িয়া তোলা সহজ হইতে পারে কিন্তু নূতন কোনো কিছু, বিশেষতঃ স্ত্রীবিদ্যালয়ের ন্যায় নূতন কিছু, অসংখ্য বাধাবিঘ্নের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা দুরূহ। এই কারণেই সর্ব্বপ্রকার সদ্বিষয়ের পথপ্রদর্শক-দিগের এত সম্মান ও প্রতিপত্তি। রাজা সার রাধাকান্ত দেব তাঁহার "স্ত্রী-শিক্ষাবিধায়ক" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে "শ্রীযুত সাহেব লোকেরা (বোধ হয় খৃষ্টীয় মিশনরিগণ) এই কলিকাতার নন্দন-বাগানে জুবেনাইল পাঠশাল নামে এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রথমে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করে নাই।" কিন্তু উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার সময় কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রীপাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক পাঠশালায় ন্যূনসংখ্যায় ১৬ জন ধরিয়া অন্তত ৮০০টী কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাজা বাহাদুর কিন্তু স্বীকার করিয়াছেন যে তখনও এই সকল পাঠশালায় ভদ্রপরিবারের কন্যা প্রেরিত হইত না। এই সকল পাঠশালা স্থাপনের জন্য খৃষ্টীয় মিশনরিগণ বিলাত

হইতে বিস্তর চাঁদা উঠাইয়াছিলেন। এ দেশের ৺রাজা বৈদ্যনাথ রায়ও তাহাতে ২০০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১ এই আদিকালে রাজা বৈদ্যনাথ যে এ বিষয়ে এত মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দিতেছি।

উপরোক্ত স্ত্রীপাঠশালার বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে রাজা রাধাকান্ত দেব ১৮২০ খৃষ্টাব্দের অন্তত কয়েক বৎসর পরে তাঁহার "স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক" গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। বলিতে গেলে ইহা রামমোহন রায়ের 'সহমরণবিষয়ক' প্রস্তাব হইতে উদ্ধৃত উক্তি বিস্তৃত ব্যাখ্যা মাত্র। দুই একস্থলে রামমোহন রায়েরই উক্তি দুই একটী কথামাত্রের পরিবর্ত্তন সহ অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। ২ রাজা রাধাকান্ত দেব যে ব্রহ্মসভার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান তদানীন্তন ধর্ম্মসভার, এক কথায় তদানীন্তন সাকারবাদী হিন্দুসমাজের দলপতি হইলেও স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা বুঝিয়া এই বিষয়ে রামমোহন রায়ের উক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, ইহাতে তাঁহারই হৃদয়ের উদারতা ও মহত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এবং তাঁহার ন্যায় মহৎ ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করিয়া যে দেশের কতদুর উপকার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

রাজা রাধাকান্ত "একটী কল্পিত নাম ধারণ করিয়া" এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। ৩ এই গ্রন্থে তিনি স্ত্রীশিক্ষার উপকারিত্ব বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা

---

১ শ্রীতারাশঙ্কর শর্ম্ম বিরচিত "ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা"—কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ।

২ দৃষ্টান্ত স্বরূপে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ;—"যদি বল স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অল্প * * * এ কথা অতি অনুপযুক্ত। * * * এ দেশের স্ত্রীলোকদের পড়াশুনার বিষয়ে বুদ্ধি পরীক্ষা সম্প্রতি কেহ করেন নাই ; এবং শাস্ত্রবিদ্যা, জ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করাইলে যদি তাঁহারা বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে না পারেন, তবে তাঁহাদিগকে নির্ব্বোধ কহা উচিত হয়।" ইত্যাদি

৩ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—স্ত্রীশিক্ষা প্রবন্ধ।

করিলে স্বামীকে পত্র লিখিয়া, শিশুসন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইয়া এবং বাটীর হিসাব রাখিয়া অনেক পরিমাণে গৃহস্থের উপকারী হইতে পারে। এই গ্রন্থে তিনি প্রাচীন কালের মৈত্রেয়ী, শকুন্তলা, অনসূয়া, বাস্কট রাজার কন্যা, দ্রৌপদী, ভগবতী প্রভৃতি এবং অপেক্ষাকৃত অধুনা-কালের লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী, খনা, লীলাবতী, রাণী ভবানী, হটীবিদ্যালঙ্কার ও শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকের শিক্ষার বর্ণনা করিয়া রমণীগণকে বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে বিদেশীয় বিদুষী রমণীর পরিবর্ত্তে স্বদেশের বিদুষীগণের দৃষ্টান্ত দিয়া বড়ই সূক্ষ্মদর্শিতার কার্য্য করিয়াছেন। যাঁহারা বলেন যে তাঁহাদের স্ত্রী-কন্যাগণ গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষার সময় পান না, গ্রন্থকর্ত্তা একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা তাঁহাদের সেই যুক্তি সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়াছেন। দুইটী কুলবধূর কথোপকথনচ্ছলে এই দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে—

"প্রশ্ন। ঘরের পাইট বাঁইট কুটনা বাটনা রাঁধাবাড়া দেওয়া থোয়া করিতেই দিন যায়, তবে কখন্ শিখিব ?"

"উত্তর। ওলো, যে রাঁধে সেকি চুল বাঁধে না ? অতএব উহারি মধ্যে মাড়নের গরুর ঘাস খাওয়ার মত একটু একটু শিখিলেই রক্ষা নাই।"

এই পুস্তক প্রকাশের প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পরে ইহার বিপক্ষে "স্ত্রী-দুরাচার" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'স্ত্রীদুরাচার' প্রণেতা স্বকীয় গ্রন্থে 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' গ্রন্থের যুক্তিগুলি খণ্ডন করিতে গিয়া অন্যায়রূপে স্ত্রীলোকদিগের অনেক নিন্দাবাদ করিয়াছেন। * এরূপ অজস্র মিথ্যা নিন্দাবাদে সত্যস্বরূপ ভগবানের মঙ্গলচক্র প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে না। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের দ্বারা দেশের মঙ্গল হইবে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা—কে সেই অপ্রতিহত ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সমর্থ ? দেখিতে দেখিতে আরও কয়েক বৎসর পরে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন (Hon'ble Drinkwater Bethune) কর্ত্তৃক এই কলিকাতা মহা-নগরীতে বিটন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে খৃষ্টীয়

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৭৯৮ শক, জ্যৈষ্ঠ।

মিশনরিদিগের যত্নে অনেকগুলি স্ত্রীপাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল. কিন্তু বিটন সাহেবই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীলোকের জন্য রীতিমত বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষার অভাব ও তজ্জন্য চতুর্দ্দিকে ভীষণ অমঙ্গলরাশি উৎপন্ন হইতে দেখিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরলের সভাসদ্ মহাত্মা বিটনের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তখনকার কৌলীন্যপ্রথার প্রাবল্য এবং তৎসঙ্গে স্ত্রীলোকের নিরক্ষর থাকা, এই উভয়ের পরস্পরের সহযোগে দেশে যে গভীর অন্ধকারের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে আজ আমাদেরও প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বিটন-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় হইতেই যে সেই প্রলয়গতির পথ অনেক পরিমাণে রুদ্ধ হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিটন সাহেব তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত ইহাকে অতি যত্নে নিজব্যয়ে পোষণ করিয়া তাঁহার দেহাবসানের কিছু পূর্ব্বে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে একখানি দানপত্রের দ্বারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া দেন। তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল মার্কুইস অব ডালহৌসী স্বয়ং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার পরে গবর্ণমেণ্ট ইহার ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। যে ভূমিখণ্ডের উপর এবং যে অট্টালিকায় এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত, সেই ভূমিখণ্ড রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং সেই অট্টালিকা বিটন সাহেব প্রদান করেন। মহামহোৎসবের সহিত ইহার ভিত্তিস্থাপনকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। "সে দিবস বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থানে অশোক বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল, দ্বারে পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ধ্বজা উড্ডীন করিয়া ফ্রীমেসন সম্প্রদায়ের লোকেরা বাদ্যোদ্যম সহকারে বিদ্যালয়ের মূলপ্রস্তর প্রোথিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাত্মা বিটন সাহেবকে উল্লিখিত বিদ্যালয় সংস্থাপনকার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপরে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বঙ্গদেশে অনেকগুলি বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করেন।" * বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাত্রীসংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যে সহায়তা না করিলে মহাত্মা বিটন

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৭৯৮ শক, জ্যৈষ্ঠ।

এই বিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম বিটন বিদ্যালয়ের সম্পাদকপদে বরিত হয়েন। ব্রাহ্ম-সমাজের ইহা গৌরবের বিষয় যে এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ব্রাহ্ম-সমাজের দক্ষিণহস্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদকপদে নিযুক্ত ছিলেন। তখন, এক কথায়, ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, বোধ হয়, দেশের হিতজনক কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হয় নাই।

শুনিয়াছি যে সর্ব্বপ্রথম বিটন বিদ্যালয়ের তিনটী মাত্র ছাত্রী জুটিয়াছিল—তন্মধ্যে দুইটী সুপ্রসিদ্ধ ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কন্যা এবং অপরটী পাটুলির চাটুয্যেবংশীয় তদানন্তীন বংশবাটী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ৺হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা। তখনকার অবস্থা ভাবিয়া ইহা-দিগের সৎসাহসের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইহার পূর্ব্বে কোন ভদ্রলোকেই যে স্বীয় কন্যাদিগকে কোন স্ত্রীপাঠশালায় প্রেরণ করি-তেন না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সময় হইতেই কার্য্যতঃ স্ত্রীবিদ্যা-লয়ে ভদ্রপরিবারের কন্যা প্রেরিত হইতে লাগিল। এই তিনটী ছাত্রীর দৃষ্টান্তে ক্রমে অবশ্য ছাত্রীসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, যে সকল হিন্দুবালিকা অধ্যয়নার্থ উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত, তাহাদিগের অধিকাংশই অধিক বয়সে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়া বিবাহ প্রস্তাব অথবা বিবাহেরই সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ কিছু অধিক করিয়া ধরিলেও ১২ বৎসর বয়সের মধ্যেই লেখাপড়া শেষ করিতে বাধ্য হইত। এই সময়ের মধ্যে ভালরূপ লেখাপড়া শিখিবার অবসর না হওয়াতে, বলিতে গেলে, তাহাদের অক্ষর পরিচয়ের অধিক কিছুই হইত না। হিন্দু-সংসারে বিবাহের পর বালিকাদিগের বিদ্যাবিষয়ে অধিকদূর অগ্রসর হই-বার সুবিধা প্রায়ই হয় না। বর্ত্তমানে হিন্দুসংসার যে ভাবে গঠিত, তাহাতে একটী ক্ষুদ্র বালিকা বিবাহের পরই সহসা একটী পরিপক্ক গৃহিনী হইয়া পড়েন এবং তাম্বূল দোক্তা চর্ব্বণের সঙ্গে প্রতিবাসী, আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতি নিজ বাটীতে অভ্যাগত পাঁচজনের সহিত অথবা পাঁচজনের বাটীতে যাইয়া তাহাদের সহিত পরচর্চ্চা প্রভৃতি নানাবিষয়ক গল্প গুজব করিতে শুনিতেই সময় অতিবাহিত করিয়া দেন, কাজেই তাঁহাদের জ্ঞানার্জ্জন

করিবার অবসর ঘটিয়া উঠে না। এবং ঐ সকল বালিকাগৃহিণীর মধ্যে কেহ একটু সময় বাঁচাইয়া পড়িতে ইচ্ছা করিলেও, তিনি সুলভ মুদ্রাযন্ত্র হইতে উদ্গীর্ণ রাশি রাশি সুলভ নভেল নাটক ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টাকরেন না; ইহা অতি স্বাভাবিক। অবশ্য এই কথা যে সকলেরই পক্ষে প্রযুক্ত হইবে তাহা নহে, তবে অধিকাংশেরই পক্ষে ইহা সত্য। বিদ্যাবিষয়ে অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া ঐরূপ চিত্তবিক্ষেপক গ্রন্থমাত্রেই সন্তুষ্ট থাকিলে পাঠিকাদের সংযমস্পৃহা যে ক্রমে হ্রাস হইতে পারে এবং সুতরাং নানা কুফলও ঘটিতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য। এই কারণেই "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" প্রভৃতি প্রবাদবাক্য দেশ বিদেশে চলিয়া আসিতেছে। আর, বাস্তবিকও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের কৈশোরকালে অনেক স্থলে এই "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করীর" কুফল ফলিতে দেখা গিয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গলা নভেল নাটক বিষম অনুপাতে আবির্ভূত হইয়া আগুনের মত চারিদিক ছাইয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, তন্মধ্যে অবৈধ প্রেম, হতাশপ্রেম ও তৎপরিণামে আত্মহত্যা বিষদান প্রভৃতি বিষয়ে সংরচিত নাটকের কিছু বেশী বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। আবার অনেকগুলি নূতন রঙ্গভূমি সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে দেশব্যাপী একটা কিম্ভুতকিমাকার নাটুকে ঝড় প্রবাহিত হইয়াছিল। ভদ্রগৃহের কন্যাগণ, বিশেষত সংসারকার্য্যে বিমুখ, চঞ্চলস্বভাব অথবা কিছু বেশী আদরপ্রাপ্ত কন্যাগণ রঙ্গভূমিতে ঐরূপ নাটক সকল অভিনীত হইতে দেখিয়া অধিকতর চঞ্চলস্বভাব গৃহে আনয়ন করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা একদিকে নভেলী ও নাটুকে ভাবকে আদর্শ করিতে লাগিল, আবার মেয়েরাও এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া গৃহমধ্যে নানা কার্য্যে ইহার অঙ্গপ্রভাব আপনাদের পরিপার্শ্বে বিস্তৃত করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। এই সকলের সংযোগফলে কয়েক বৎসর পূর্ব্বপর্য্যন্ত ভদ্র পরিবার মধ্যেই আত্মহত্যা প্রভৃতি নিতান্ত অন্যায় কর্ম্মসমূহের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল, ইহা সমসাময়িক সংবাদপত্র দেখিলেই সহজে উপলব্ধ হইবে।

বয়স্কা বালকবালিকাদিগের নভেল নাটক পাঠ ছাড়িয়া দিলেও নিতান্ত শিশুদিগের জন্য যেরূপ পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইত, তাহাতে সুফলের সম্ভাবনা

পর্য্যন্ত বিদূরিত হইয়াছিল। "শিশুবোধক" নামক একখানি গ্রন্থ শিশু-দিগের, স্ত্রীলোকের এবং পল্লীগ্রামে প্রায় সর্ব্বসাধারণের মস্তিষ্কের প্রখরতার নিকষপ্রস্তর এবং জ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া গৃহীত হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বর্ণপরিচয়" ইহাকে অন্ততঃ এই মহানগরী হইতে প্রায় সম্পূর্ণই নির্ব্বাসিত করিয়াছে, ইহা অনুপম সুখের বিষয়। কিন্তু পল্লীগ্রাম হইতে ইহার সম্পূর্ণ নির্ব্বাসন যে হয় নাই, তাহা সুপ্রসিদ্ধ বটতলায় সংবাদ লইলেই জানা যাইতে পারে। এই পুস্তকের অন্তর্গত সরস্বতীর বন্দনা, কড়াঙ্কিয়া শতকিয়া প্রভৃতি, কলঙ্কভঞ্জন প্রভৃতি শিশুদিগের অপাঠ্য গল্প, চাণক্যশ্লোক, এ সকলের দ্বারা বালকের মনুষ্যত্ব বা বালিকার মাতৃত্ব বর্দ্ধিত হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই, বরঞ্চ এই সকল যে কত শত বালকবালিকাকে ব্রহ্মচর্য্যের পথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়াছে, তাহার হয়তো সংখ্যা হয় না। আমরা এই পুস্তক হইতে দুইটী, একটী স্বামীকে স্ত্রীর, অপরটী স্ত্রীকে স্বামীর, পত্র লিখিবার ধারা উদ্ধৃত করিতেছি।

১। "স্বামীকে স্ত্রীলোকের পত্র লিখিবার ধারা।"

"শ্রীচরণসরসি দিবানিশি সাধনপ্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতীমুঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদসরোরুহ স্মরণ-মাত্রে অত্র শুভম্বিশেষ। পরং নিবেদন মহাশয় ধনাভিলাষে পরদেশে চির-কাল কালযাপন করিতেছেন যেকালে এ দাসীর কালরূপ লগ্নে পাদক্ষেপণ করিয়াছেন সে কাল হরণ দ্বিতীয়কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে অতএব পরকালে কালরূপকে কিছুকাল সান্ত্বনা করা দুইকালের সুখোদয় বিবেচনা করিবেন। দ্বিতীয় কালের সাধনের ধন অনরামৃত (?), তৃতীয় কালের কালানুসারে কালকূট বোধ হইবে, অতএব বহুকাল কালস্বরূপ মনে উদ্ভব হয় যে আগতকাল আগতপ্রায় এইরূপে আগত আগত ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়াগত উন্নত হইয়া অধোগতপ্রায় হইয়াছে অতএব জাগ্রৎ নিদ্রিতা ন্যায় সংযোগ সংকলন পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীচরণযুগলে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদন ইতি, সন ১২৮৭ সাল তাং ২১ চৈত্র।

"শিরোনামা—ঐহিক পারত্রিক নিস্তারকর্ত্তৃক ভবার্ণব নাবিক
শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয়
পদ পল্লবাশ্রয় প্রদানেষু।"

২। "স্ত্রীকে পত্র লিখিবার ধারা।"

"পরম প্রণয়ার্ণব গভীর নিরতীর নিবাসিত কলেবরাঙ্গাসম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত শ্রীঅনঙ্গমোহন দেবশর্ম্মণঃ ঝটিক ঘটিত বাঞ্ছিতান্তঃ-করণে বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ ৺মতীর শ্রীকরকমলাঙ্কিত কমলপত্রী পঠিতমাত্রে অত্র শুভম্বিশেষ। বহুদিবসাবধি প্রত্যাবধি নিরবধি প্রয়াস প্রবাস নিবাস তাহাতে কর্ম্মফাঁস বিনাশ ব্যতিরিক্ত উত্যক্তান্তঃকরণে কালযাপন করি-তেছি অতএব মননয়ন প্রার্থনা করে যে সর্ব্বদা একতা পূর্ব্বক অপূর্ব্ব সুখোদ্ভব মুখারবিন্দ যথাযোগ্য মধুকরের ন্যায় মধুমাসাদি আশাদি পরিপূর্ণ হয় প্রয়াসা মীমাংসা প্রণীতা শ্রীশ্রীঈশ্বরেচ্ছা শীতান্তে নিতান্ত সংযোগ পূর্ব্বক কালযাপন কর্ত্তব্য ধনোপার্জ্জন তদর্থে, তৎসম্বন্ধীয় কর্ত্তৃকা দুঃখিত। এতাদৃশ উপার্জ্জনে প্রয়োজন নাই স্থিরসিদ্ধান্ত করিতেছি, জ্ঞাতমিতি।

"শিরোনামা—গুণাধিকা স্বধর্ম্মপরিপালিকা
শ্রীমতী মালতীমুঞ্জরী দেবী সাবিত্রী ধর্ম্মাশ্রিতেষু।"

যাই হোক্, আজকাল শিক্ষার বিস্তৃতি এবং সুলভ মূল্যে ভাল ভাল পুস্তক প্রকাশের ফলে অল্পবিদ্যার দুর্গন্ধ বায়ু কিঞ্চিৎ প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। নানা কারণে কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এমন অবস্থা হইয়াছিল যে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার নাম করিলেই অধিকাংশ লোকে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করি-বার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু মোটের উপর এই স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা সুফল হইয়াছে ও হইতেছে, তাই ইহার বিলোপ সাধনের পরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ হইতেছে। এখন যেমন ভাল ভাল পুস্তক সুলভ মূল্যে প্রকাশিত হইতেছে, সেইরূপ অনেকেই আপনাদিগের স্ত্রীকন্যা-দিগকে নভেল নাটক না পড়াইয়া জ্ঞানগর্ভ পুস্তক সকল পড়াইতে অভিলাষ

করেন—এতদিনে অল্পবিদ্যার প্রথম উচ্ছৃঙ্খলতা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা কৈশোর অবস্থা হইতে বাল্যে পদার্পণ করিতেছে। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা এখন যে ভাবে চলিতেছে, তাহা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার পূর্ব্বক হংসরাজের ক্ষীর গ্রহণের ন্যায় মন্দ অংশ বর্জ্জন করিয়া শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে বিবেচনা করি।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# সনাতন গোস্বামীর পদাবলী।

কৃষ্ণচন্দ্র ও গৌরচন্দ্রের লীলাবিলাসপল্লী ভাবপুষ্পপুঞ্জ ও প্রেমফলময় পদকল্পতরুতে সনাতন গোস্বামীর কয়েকটী 'পদ' সন্নিবেশিত আছে। নিবদ্ধপদ গুলির সংখ্যা ত্রিশের অধিক হইবে না। কিন্তু সেই ত্রিশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীত হইতেই এই বৈষ্ণব কবিকে বেশ চিনিতে পারা যায়।

পদাবলির পরিচয়ের পূর্ব্বে পদকর্ত্তার জীবনের কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্যকে জানিয়া 'রূপসনাতনের' নাম শোনেন নাই এরূপ বাঙ্গালী অতি অল্পই আছেন। এই 'রূপসনাতন' শব্দটী প্রায়ই আমরা একত্র শুনিতে পাই; অনেকের এখনও ধারণা থাকিতে পারে যে উহা একজনেরই নাম। বস্তুতঃ তাহা নহে; নিতাই গৌর যেমন দুই জনের নাম, জগাই মাধাই যেমন দুই জনের নাম, শ্রীরূপ ও সনাতনও সেইরূপ দুইজনের নাম। তাঁহারাও দুই ভ্রাতা ছিলেন। সনাতন জ্যেষ্ঠ, শ্রীরূপ কনিষ্ঠ—শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক।

বৈষ্ণব কবি রাধাবল্লভদাস কৃত সনাতন মাহাত্ম্যবর্ণনায় ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিতাভাষ যতটুকু পাওয়া যায় আপাততঃ তাহাই আমাদের যথেষ্ট। তাহাতে লেখা আছে।

"শ্রীরূপের বড় ভাই সনাতন গোসাঞি
পাতসার উজীর হয়েছিলা।

ইতিপূর্ব্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিতে ছিলেন।

"রূপের বৈরাগ্য কালে সনাতন বন্দীশালে
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
রূপেরে করুণা করি ত্রাণ কৈলা গৌরহরি
মো অধমে না কৈলা স্মরণে॥"
"হেনকালে একজনে অলখিতে সনাতনে
পত্রী দিল রূপের লিখন।"

সনাতনও, কোন মতে, "শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া বন্দী হ'তে পলাইয়া
কাশীপুরে গৌরাঙ্গে ভেটিলা।"
"গৌরাঙ্গ করুণা করি, রাধাকৃষ্ণ নাম মাধুরী
শিক্ষা করাইল সনাতনে।"

চৈতন্য দেবই তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইতে উপদেশ দেন। তাঁহার আদেশ ক্রমে

"গিয়া গোসাঞি সনাতন প্রবেশিলা বৃন্দাবন
রূপ সঙ্গে হইল মিলন।"

মনোহর দাসের পদাবলীতে লিখিত আছে; শ্রীল সনাতন সকল সুখ সম্পদ ত্যাগ করতঃ শ্রীচৈতন্যচরণ সার করিয়া,

"শ্রীবৃন্দাবন ভূমে করি বাস
লুপত তীর্থ সব করল প্রকাশ;
শ্রীগোবিন্দ সেবা পরচারি
করল ভাগবত অর্থ বিচারি।
যুগল ভজন লীলা গুণ নাম
করল বিথার গ্রন্থ অনুপাম॥"

সম্ভবতঃ এই সময়েই তিনি বক্ষ্যমান পদ সকল রচনা করেন।

সনাতন গোস্বামীর পদাবলি সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। অমর ও অমৃত নিস্যন্দী কবি জয়দেবের সমকক্ষ না হইলেও তাঁহার ভাষা সুগেয় ও সুমধুর। বলা বাহুল্য উভয় বৈষ্ণব কবির সমুদয় গীতই রাধাকৃষ্ণ লীলা

বিষয়ক কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের মহিমাবর্ণন। জয়দেব শ্রীচৈতন্যের প্রাদুর্ভাবের দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে আবির্ভূত হয়েন; কিন্তু সনাতন গোস্বামী গৌরাঙ্গের প্রিয়শিষ্য এবং স্বয়ং চৈতন্যচরিতাখ্যায়ক চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের প্রণেতা হইলেও উভয়ের পদাবলিতে গৌরাঙ্গাবতারের নামগন্ধও নাই। উভয়েই কেবল শ্রীমদ্ যশোদাসুত এবং আভীরকন্যাপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের ললিতগুণ কথার নিপুণ কথক।

বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে জয়দেব, সনাতন ও রামানন্দ রায় এই তিন জন সংস্কৃত ভাষায় গীত রচনা করিয়াছেন। তিন জনেই বঙ্গদেশোদ্ভব ও বাঙ্গালীর গৌরবস্থল সন্দেহ নাই।

সমালোচনা কিম্বা তুলনা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সুরাগরঞ্জিত সুললিত গীতগুলির পরিচয় দিতেছি মাত্র। সহৃদয় গুণজ্ঞ পাঠকগণ তদ্রচিত পদনিচয় পাঠমাত্রেই তাঁহার দেবভাষায় পাণ্ডিত্যাধিকার ও কবিত্বশক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

অপরাপর বৈষ্ণব কবিদিগের ন্যায় তিনিও শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ অভিসার উৎকণ্ঠা বিরহাদি বর্ণন করিয়াছেন। এমন কি শ্রীকৃষ্ণের ও রাধিকাদি ব্রজযুবতীগণের সহিত রাসলীলা ও হোরিক্রীড়াদি বর্ণন করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই।

মধ্যে একস্থলে জন্মলীলা ও নন্দোৎসবের বিবরণ দিয়াছেন। গোপকুলের মহানন্দের সহিত নন্দরাণী যশোদা উদার পুত্র প্রসব করিলেন। তখন

"কাপ্যুপনয়তি বিবিধমুপহারং।
নৃত্যতি কোঽপি জনো বহুবারং॥
কোঽপি মধুরমুপগায়তি গীতং।
বিকিরতি কাপি সদধিনবনীতং॥
কোঽপি তনোতি মনোরথপূর্ত্তিং।
পশ্যতি কোঽপি সনাতন মূর্ত্তিং॥"

প, ক—ত, ১১২৬ (৩।১৮।৪)

গোস্বামী শ্রীরাধার জন্মোৎসবে উন্মত্ত হয়েন নাই বটে কিন্তু তাঁহার

পূর্ব্বরাগ অনুরঞ্জনে কবির সবিশেষ অনুরাগ। শ্যামচন্দ্র দর্শনে কমলিনী তাঁহার দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার 'মন জলতহ অনুক্ষণ

দোলত চপল পরাণ।'

(গোবিন্দদাস)

তিনি 'পুনঃ পুনঃ গতাগতি কর ঘর পন্থ।
ক্ষণে খেনে ফুলবনে বলই একান্ত॥
ছল ছল নয়ন কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ॥" (রাধামোহন)

বিনোদিনীর উঠিতে বসিতে শোয়াস্তি নাই। তাঁহার কি ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিলেও সখীরা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে;—

"রাধে নিগদ নিজং গদমূলং।
উদয়তি তনুমনু কিমিতি পুলককুল মনুকৃত বিটপ-মুকুলং॥
প্রচুর-পুরন্দর-গোপ-বিনিন্দিত-কান্তিপটলমনুকূলং।
ক্ষিপসি বিদূরে মৃদুলং মহুরপি সংভৃতমুরসি দুকূলং॥"

প, ক, ত, ৬৯,

সুবাসিত তাম্বূল তোমার ভাল লাগিতেছে না; সুন্দর চম্পকমালাখানির ফুলগুলি এক এক করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছ; সখি, তোমার কি হইয়াছে? প্রত্যুত্তরে রাধিকা বলিলেন—আমার কি হইবে। কেন তোমরা বারংবার আমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ! জাননা কি সেই বল্লভ (গোপ) রাজকুমারকে দেখিয়া আমার মন মুগ্ধ হইয়াছে দেখ,

"কুটিলং মামবলোক্য নবাম্বুজমুপরি চুচুম্ব সরঙ্গী।
তেন হটাদহমভবং বেপথুমণ্ডলসঙ্কুলদঙ্গী॥"

আবার "দাড়িমলতিকামনু শোভনফলনির্মিতাং স দধে হস্তং।
তদনুভবান্মম ঘর্ম্মজলে সখি ধৈর্য্যধনং গতমস্তং॥" প, ক, ত, ৭২,

রসিক সে আমার হস্তধারণ করিল, তাহাতে আমার দেহ অবশ হইয়া আছে, ধৈর্য্যধন অস্তগত হইয়াছে আমি কি করিতেছি সব বুঝিতে পারিতেছি না।

সব জানাজানি হইয়া গেল। শ্রীমতী বল্লভের নিকট আপ্তদূতী প্রেরণ

করিলেন। সে ব্রজকুমারীর দশদশা বর্ণন করিতে করিতে সপ্তম ব্যাধি দশায় আসিয়া বলিতেছে, হে দেব হরে! সখীর প্রতি করুণাশালী হও—

"মা.তব নিশিতকপঙ্ক শরাহতহৃদয়া জীবতি কৃশতনুরাশী।

হায়, হৃদি বলদবিরল সংজ্বর পটলীস্ফুটমুজ্জ্বল মৌক্তিক সমুদায়া।

শীতল ভূতল নিশ্চল তনুরিয়মবসীদতি সংপ্রতি নিরুপায়া॥"

হে মাধব গোপগণের তুমি অভয়স্থল, তোমা হইতেই হায় এই তদ্গতপ্রাণা ব্রজবালা বিষমদশা প্রাপ্ত হইতেছে! ইহা নিতান্তই অযুক্ত!

মাধব আজ কুঞ্জে আসিবেন সঙ্কেতে বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধিকার বাসর সাজাইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। সখীকে ডাকিয়া বলিতেছেন—

"কুসুমাবলিভিরুপস্কুরু তল্পং।

মাল্যঞ্চামল মণিময় কল্পং॥

প্রিয়সখি! কেলি পরিচ্ছদপুঞ্জং।

উপকল্পয় সত্বরমধিকুঞ্জং॥" প, ক, ত, ৩৫৬

রাতি পোহাইয়া যায়; শ্যামের দেখা নাই। রাই বড়ই উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। কেন তিনি অধীনীকে ভুলিয়াছেন; হায়,

"কিমু চন্দ্রাবলিরনয় গভীরা।

অরুণদমুং রতিবীরমধীরা!" প, ক, ত, ৩৬৩

রজনী শেষে ব্রজবনিতাকুলকমলসবিতা শ্রীরাধার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। খণ্ডিতা বিনোদিনী তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন;—

"হৃদয়ান্তরমধিশয়িতং।

রময় জনং নিজ দয়িতং॥

"কিমফলমপরাধিকয়া।

সম্প্রতি তব রাধিকয়া॥"

"পরিহর কপট তরঙ্গং।

বেত্তি ন কা তব রঙ্গং॥"

প, প, ত, ৩৭১

মাধব শ্রীমতীর চরণে নিপতিত হইয়া বলিতেছেন—

"সুন্দরি কাহে কহসি কটুবাণী।

তোহারি চরণ ধরি শপতি করিয়ে কহি
তুঁহু বিনে আন নাহি জানি।" (জ্ঞানদাস)

শ্রীমতীর মান ভাঙ্গিল না—তিনি বলিতেছেন,—

"যাং সেবিতবানিশি জাগরী।
শ্যামভজৎ সা নিশি নাগরী॥
কপটমিদং তব বিন্দতি হরে।
নাবসরং পুনরালি নিকরে।
মা কুরু শপথং গোকুলপতে।
বেত্তি চিরং কা চরিতং ন তে॥" প, ক, ত, ৩৮৭

সেদিনকার অভিনয় মিলনে অন্ত হইল। আবার শ্রীকৃষ্ণ দেখা করেন না। শ্রীমতীর আবার অভিমান হইয়াছে। তিনি

"অবনত বয়নী ধরনী নখে লেখি।
যো কহে শ্যাম নাম তাহে না পেখি॥" (বিদ্যাপতি)

বনদেবী দেখিয়া গিয়া মানিনীর বিষয় শ্রীকৃষ্ণের গোচরে সমস্তই ব্যক্ত করিল। তিনি শ্রীমতীকে প্রবোধ দিবার জন্য সখী প্রেরণ করিলেন। সে কত সান্ত্বনা দিল, বলিল—

"তোহারি বিরহ বেদনে ধাওয়ে সুন্দর মাধব মোর।" (বিদ্যাপতি)

কে তাহার কথায় কর্ণপাত করে। অভিমানিনী বলিলেন;—

"দূতি বিদূরয় কোমল কথনং।
পুনরভিধাস্যে নহি মধুমথনং॥
শঠচরিতোয়ং তব বনমালী।
মৃহুহৃদয়াহং নিজকুলপালী॥" প, ক, ত, ৫৩২

একদিন ব্রজবধূ শ্রীরাধিকা হরগৌরী আরাধন ব্যপদেশে রাজবর্ত্মে বাহির হইয়াছেন। অদূরে কুঞ্জবনে শ্যামের মুরলী রাধা রাধা বলিয়া বাজিয়া উঠিল। রাধা সেই পথেই অগ্রসর হইলেন। দুইপদ না যাইতে যাইতেই তমালতলের সূক্ষ্মমার্গেই বনমালী তাঁহার কালোরূপে তমালতল আলো করিয়া বংশী হস্তে ত্রিভঙ্গিমরূপে তাঁহার পথ অর্গলিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীরাধা বলিলেন;—

"ন কুরু কদর্থনমত্রশরণ্যাং।
মামবলোক্য সতীমশরণ্যাং॥
চঞ্চলমুঞ্চ পটাঞ্চল ভাগং
করবাণ্যধুনা তাবক যাগং॥" প, ক, ত, ৬৩০

বিনতি করিতেছি, গোকুলবীর আর বিলম্ব করাইও না; দেখ,

"পুলকমুপৈতি তবাশ্রম গাত্রং।
হসসি তথাপি মদাদতি মাত্রং॥"

তাঁহার সখী সঙ্গে ছিল, তাহাকে বলিলেন;

বারয় তূর্ণমিমং সখি কৃষ্ণং।"

কে তাঁহার কথা শোনে। রাধিকা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন;—

"জানে ভবতী মেব বিপক্ষাং।
মামুপনীতাং বহুকুপ কক্ষাং॥" প, ক, ত, ৬৩১

আজ চন্দ্রকরোজ্জ্বল পূর্ণিমা রজনী। সমস্ত বৃন্দাবন ভূমিতে জ্যোৎস্নার তরঙ্গ উঠিয়াছে। সেই গগনক্ষরিত রজত তরঙ্গ গোকুলচন্দ্রের মুরলীধ্বনি আর বৃন্দাবিপিনের পুংস্কোকিল রবের সহিত সম্মিলিত হইয়া উজ্জ্বল যমুনার কৃষ্ণতরঙ্গ ছাইয়া ফেলিতেছে। কুসুমগণও তাহাদের সুকোমল তরল হাস্য বিকীরণে চন্দ্রকিরণ সান্দ্রীভূত করিয়াছে। সকলেই যেন কি এক উল্লাসে মগ্ন। শ্রীরাধিকার মনও যেন কেমন কেমন করিতেছে। যেন তাঁর কার কথা মনে পড়িতেছে। এমন সময়ে তাঁহার সখী আসিয়া তাঁহাকে আরও মাতাইয়া তুলিল।

ইহার পরে রাধিকার অভিসার বর্ণনা; তারপরে রাসলীলা। শারদীয় রাসলীলানিরত শ্রীহরিকে কবি সনাতন গোস্বামী এইরূপে স্মরণ করিয়াছেন;

"কোমল শশিকর রম্যধনান্তর-নিস্বন গীত বিলাস।
তূর্ণসমাগত-বল্লভ যৌবত-বীক্ষণ কৃত পরিহাস॥
ভানুসুতাতটরঙ্গমহানট-সুন্দরনন্দকুমার।
শরদঙ্গীকৃতদিব্যরজাবৃত-মণ্ডল রাস বিহার॥

* * *

অম্বু বিগাহন-নন্দিত-নিজজন-মণ্ডিত যমুনাতীর।
সুখসম্বিলিন পূর্ণ সনাতন নির্ম্মল নীলশরীর॥"

প, ক, ত, ১২৭৩

বসন্তলীলাগত ও তাঁহার স্তব সমান সুন্দর ;

"অভিনব কুট্মল গুচ্ছ সমুজ্জ্বল কুঞ্চিত কুন্তল ভার।
প্রণয়িজনেরিত চন্দন সহকৃত চূর্ণিত বরঘনসার॥
জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার।

প, ক, ত, ১৪২২

পুনরায়

কেলিরস মাধুরী-ভতিভিরভিমেদুরী
কৃত নিখিল বন্ধু পশুপালং।
হৃদি বিধৃত চন্দনং স্ফুরদরুণ-স্যন্দনং
দেহরুচিনির্জ্জিত তমালং॥
সুন্দরি! মাধরমবকলয়ালং।
মিত্র কর লোলয়া মন্দময় দোলয়া
চলিত বপুরতিচপল মালং॥
রঙ্গহরিণ লোচনা-রচিত-গোরোচনা
তিলক-রুচি-রুচিরতর-ভালং।
স্মিত জনিত লোভয়া বদনশশিশোভয়া
বিভ্রমিতনবযুবতিজালং॥"

প, ক, ত, ১৪২৩

সনাতন কবি তাঁহাদের হোরিক্রীড়া ও জলক্রীড়াও দেখিতে ভুলেন নাই।

"বিহরতি সহ রাধিকয়া রঙ্গী।
মধুমঙ্গলে বৃন্দাবন রোধসি হরিরিহ হর্ষ তরঙ্গী॥
বিকিরতি যন্ত্রেরিত মথবৈরিণি রাধাকুঙ্কুমপঙ্কং।
দয়িতামপি সিঞ্চতি মৃগমদরসরাশিভিরবিশঙ্কং॥

*   *   *   *

স্মরণোরণয়তি ঘন করতালীং জিতবান্ জিতবানিতি বনমালী।
ললিতা বদতি সনাতনবল্লভ মজয়ৎ পঞ্চ মমালী॥"

প, ক, ত, ১৪৪১

শুদ্ধ শ্রীরাধার সঙ্গে নহে, চন্দ্রাবলি-বিশাখা-ললিতা-পদ্মা-ভদ্রা প্রভৃতি শ্রীগোবিন্দানুরক্তা যাবতীয় গোকুল যুবতিগণের সহিত সনাতন গোস্বামী তাঁহাকে হোরি খেলাইয়াছেন। তাঁহাদিগের খেলাদর্শনে ঋতুরাজ আনন্দে গরগর; কেননা,

"মলয়ানিল-গুরু শিক্ষিতলাস্যা।
নটতি লতাবলি কুঞ্জলহাস্যা॥
পিকততিরিহ বাদয়তি মৃদঙ্গং।
পশ্যতি তরুকুল মঙ্কুরদঙ্গং॥
গায়তি ভৃঙ্গঘটাদ্ভুত লীলা।
হরিবংশীব সনাতনশীলা॥" প, ক, ত, ১৪৬২

এত কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহে একবার না কাঁদাইলে বৈষ্ণব কবির গীতগুলি যেন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কবি সনাতন সে সনাতনপ্রথা লঙ্ঘন করেন নাই।

"কুর্ব্বতি কিল কোকিলকুল উজ্জ্বল কলনাদং।
জৈমিনিরিতি জৈমিনিরিতি জল্পতি সবিষাদং॥
মাধব তব বিয়োগতমসি নিপপাত রাধা।
বিধুরনলিনমূর্ত্তিরধিক সমধিরূঢ়বাধা॥
নীল নলিনমাল্যমহহ বীক্ষ্য পুলকবীতা।
গরুড় গরুড় গরুড়েত্যাতি রৌতি পরমভীতা॥"

প, ক, ত, ১৮৪৩

রুচির বৈলক্ষণ্য বশতঃ আমাদের আর এ সকল অধিক দেখিতে ভাল লাগিতেছে না। ভক্ত কবির সহিত আমরাও সেই পুরুষোত্তম দেবের পাদবন্দনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি;

"দেব ভবন্তং বন্দে।
মন্মানস মধুকরমর্পয় নিজপদপঙ্কজমকরন্দে॥

ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব ন ত্বয়ি মমতিশ্র মাত্রী।
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক দুর্ঘট ঘটন বিধাত্রী ॥
অয়মবিলোলতয়াদ্য সনাতন কলিতাদ্ভুত রসভারং।
নিবসতু নিত্যমিহামৃতনিন্দনবিন্দমধুরিমসারং ॥"

প, ক, ত, ২৯৩৩

শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষাল।

---

# ফুলচাঁদ।*

রাজস্থানে ফুলচাঁদ নামক জনৈক ধনাঢ্য রাজপুত বাস করিতেন। কালক্রমে তাঁহার দৈন্যদশা উপস্থিত হইল। যে গ্রামে তিনি অবস্থিতি করিতেন তাহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের অবিচ্ছিন্ন অধিকারে ছিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের গো, মেষাদি ও গুপ্তরত্ন সঞ্চিত হইয়া ছিল। মানব-জীবন পরিবর্তনশীল—হায়! এখন সে গ্রাম তাঁহার নয়; এক্ষণে কোন মেষাদিও তাঁহার নাই এবং কোন গুপ্তধনও নাই। তাঁহার রুগ্না স্ত্রী ও এক বৃদ্ধা পরিচারিকা ভিন্ন সংসারে আর কেহই নাই।

এক দিবস তিনি তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"এখন আমাদের ঘোর দৈন্যদশা! এতকাল আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা রাজার ন্যায় এই গ্রামে বাস করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের বংশধর হইয়া আমরা কি প্রকারে গ্রাম্য রমণীদিগের নিকট ভিক্ষা মাগিয়া দিনযাপন করিব। অতএব আমাদের এ গ্রাম হইতে অন্যত্র গমন করা কর্ত্তব্য। ফুলচাঁদের স্ত্রী সজলনয়নে স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

মধ্যরাত্রে ফুলচাঁদ তাঁহার স্ত্রী ও পরিচারিকার সহিত চিরকালের মত

---

* ইহা একটী রাজপুত্রী উপকথা। এইরূপ উপকথা সংগ্রহ হইতে জাতীয় চরিত্র কতকটা বুঝা যায় বলিয়া প্রকাশিত হইল। পুঃ সং

পৈত্রিক ভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। বহুদূর যাইতে না যাইতে তাঁহার রুগ্না স্ত্রীর পরলোক প্রাপ্তি হইল। ফুলচাঁদ পত্নীবিয়োগে অত্যন্ত কাতর হইলেন। কিন্তু "গতস্য শোচনা" বৃথা ভাবিয়া বৃদ্ধা পরিচারিকাকে লইয়া ভিক্ষা করিতে করিতে চলিলেন। নানান্ কষ্টের পর তিনি এক গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন এবং সেখানে এক মুদির দোকানে কাজ পাইলেন। প্রত্যহ দুই সের আটা ও এক ছটাক তৈল মাহিনার স্বরূপে পাইতেন।

গ্রাম হইতে কিছু দূরে এক রাজা বাস করিতেন। কিছুদিন মুদির নিকট কাজ করিয়া ফুলচাঁদ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি বৃদ্ধা পরিচারিকাকে মুদির নিকট রাখিয়া দিনকতকের ছুটী লইয়া রাজদর্শনার্থে চলিলেন। গৃহ হইতে বহির্গত হইতে না হইতেই একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি এই শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণটীকে যথাসাধ্য ভিক্ষা দান করিলেন। ব্রাহ্মণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই উপদেশ দিলেন—"একাকী কুত্রাপি যাইও না।"

অনন্তর ফুলচাঁদ রাজদর্শনার্থে বাহির হইলেন। পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন যে বালির উপর একটী ভেক পড়িয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে তিনি ভেকটীকে তুলিয়া লইলেন। কিছুদূর যাইয়া আবার দেখিলেন যে একটী বেজী সাপ ধরিতে চেষ্টা করিতেছে। তিনি বেজিটাকে তাড়াইয়া সাপটীকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। ঘটনাক্রমে হরগৌরী মানবরূপ ধারণ করিয়া তথায় বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহারা ফুলচাঁদকে বেঙ্গ ও সাপ লইয়া যাইতে দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ফুলচাঁদ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের উপদেশ বলিলেন। ফুলচাঁদ সাপ ও বেঙ্গএর প্রাণরক্ষা করিয়াছে শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে একটী অগ্নিনাশক প্রস্তর প্রদান করিলেন এবং বেঙ্গ ও সাপটীকে মণ্ডুপ সিং ও নাগ সিং নাম দিয়া তাঁহার রক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

অতঃপর ফুলচাঁদ রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং দ্বাররক্ষককে রাজার নিকট আগমনবার্ত্তা জানাইতে অনুরোধ করিলেন। দ্বারবান রাজাকে খবর দিল। রাজা ফুলচাঁদকে তাঁহার নিকট আসিতে আদেশ করিলেন।

তিনি রাজাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিলেন।

তৎকালে সেই রাজ্যে ভয়ানক চোরের উপদ্রব হইতেছিল। প্রত্যহ রজনীতে ঘরে ঘরে চুরি হইত। দলে দলে চোরেরা লুটপাট করিত। রাজা ফুলচাঁদকে বলিলেন—"যদি তুমি আজ রাত্রিমধ্যে চোর ধরিয়া দিতে পার তাহা হইলে কাল তোমাকে একটী উচ্চপদ প্রদান করিব।" ফুলচাঁদ 'তথাস্তু' বলিয়া বিদায় লইলেন।

মধ্যরাত্রে ফুলচাঁদ পাগলীর বেশ ধরিয়া রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পাইল যে চারটী চোর চুরী করিবার অভিপ্রায়ে চলিয়াছে। ফুলচাঁদ তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। তাহারা ফুলচাঁদকে দেখিয়া বলিল "পাগ্‌লী চলে যা। আমাদের সঙ্গে আসিস্‌নে।" ফুলচাঁদ বলিল—"আমিও তোদের সঙ্গে চুরি কর্‌তে যাব।" চোরেরা পরামর্শ করিল—"এই পাগলীকে দিয়া চুরি করাইব, তাহা হইলে আমরা আর ধরা পড়িব না।"

এই সিদ্ধান্তের পর পাঁচজনে একটি গৃহস্থের বাড়ী প্রবেশ করিল। ঘটনাক্রমে তৎকালে বাটীতে কেহ ছিল না। প্রত্যেক ঘর তালাবদ্ধ ছিল। কেবল একটী ঘরে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক উনানে ক্ষীর চড়াইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। চোরেরা চুরি করিবার সুবিধা না পাইয়া সেখানে হাতায় করিয়া ক্ষীর তুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। "পাগলী" "বৃদ্ধাকেও একহাতা ক্ষীর খেতে দিই" বলিয়া গরম ক্ষীর তুলিয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিল। স্ত্রীলোকটী তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিল। চোরেরা ইত্যবসরে পলাইয়া গৃহের প্রাঙ্গণে লুকাইল। কড়িকাঠ হইতে একটা দড়ি ঝুলিতেছিল "পাগলী" সেই দড়ি ধরিয়া উঠিয়া পড়িল ও লম্বমান হইয়া ঝুলিতে লাগিল। বৃদ্ধা "চোর চোর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। পাড়াপড়সীরা আসিয়া উপস্থিত হইল। ফুলচাঁদ দড়ি ছাড়িয়া লাফাইয়া পড়িল ও চোরদিগকে ধরাইয়া দিয়া নিজের পরিচয় দিল।

প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই ছদ্মবেশী ফুলচাঁদ চারিটি চোরের হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া রাজসমীপে লইয়া গেলেন। রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া

তাঁহাকে বার্ষিক লক্ষটাকা বেতন দিয়া শান্তিরক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। ফুলচাঁদ চোর দ্বারা চোর ধরিতে আরম্ভ করিলেন ও চোরদিগকে গুরুতর শাস্তি দিতে লাগিলেন। রাজ্যমধ্যে চোরের উপদ্রব কমিতে লাগিল। কিন্তু চোরদের মধ্যে মহাভয় উপস্থিত হইল। কতকগুলি চোর ফুলচাঁদের বাড়ী লুট করিয়া প্রতিহিংসা লইতে ষড়যন্ত্র করিল। একদিন রাত্রিযোগে তাহারা ফুলচাঁদের বাড়ী অন্বেষণ করিয়া লুট করিতে গেল। পথে যাইতে যাইতে তাহারা একটী বাড়ীতে স্ত্রীপুরুষের কলহ ধ্বনি শুনিতে পাইল। দেখিল একটী কৃপণ পুরুষ গার্হস্থ্য হিসাব লইয়া তাহার পরমা সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে। এই নৃশংস ব্যাপার দেখিয়া চোরেরা ফুলচাঁদের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। যাহা দেখিল, তাহাতে তাহারা অবাক হইল। একটি ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর ও তন্মধ্যে একটি কৃষ্ণকায়া বৃদ্ধা রমণী নিদ্রিতা রহিয়াছে; তাহারা এই পর্ণকুটীরটী ফুলচাঁদের বাসস্থান ও কৃষ্ণা রমণীকে ফুলচাঁদের স্ত্রী ভাবিল। ইহা দেখিয়া তাহাদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইল এবং অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। প্রতিহিংসার পরিবর্ত্তে ফুলচাঁদের উপকার করিবার ইচ্ছা তাহাদের মনোমধ্যে বলবতী হইল।

অনন্তর চোরেরা ফিরিয়া গিয়া পুনরায় পূর্ব্বোক্ত কৃপণের বাড়ী প্রবেশ করিল ও তাহার নিদ্রিতা স্ত্রীকে খাটিয়া শুদ্ধ তুলিয়া লইয়া ফুলচাঁদের পর্ণকুটীরে রাখিয়া আসিল আর ফুলচাঁদের বৃদ্ধা পরিচারিকাকে লইয়া গিয়া সজোরে কৃপণের প্রাঙ্গনে ছুড়িয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ইহার পর চোরেরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

প্রাতঃকাল না হইতেই চোরদের মধ্যে একজন মুদিকে গিয়া বলিয়া আসিল যে গত রজনীতে ফুলচাঁদ স্বীয় স্ত্রীকে তাহার গৃহে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিও।

এদিকে প্রাতঃকালে রমণী শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিল যে সে এক পর্ণকুটীরে রহিয়াছে। সে ভাবিল যে কোন দেবতা তাহার কষ্ট দেখিয়া এরূপ করিয়াছেন।

এই প্রকারে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে রমণী পীড়াগ্রস্ত হইল। মুদি ফুলচাঁদকে খবর পাঠাইল—"তোমার স্ত্রী পীড়িত হইয়াছেন শীঘ্র আইস।"

ফুলচাঁদের স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে অথচ মুদি বলিতেছে তাহার স্ত্রী পীড়িত—তাহার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। তিনি রাজার নিকট দিনকতকের ছুটী লইয়া মুদির দোকানের নিকটবর্ত্তী সেই পর্ণকুটীরে গেলেন। তিনি একটী অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী যুবতী পর্ণকুটীরে শয্যাগত রহিয়াছে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন এ কোন দেবতার লীলা। তিনি পীড়িতা রমণীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। আরোগ্য লাভের পর ফুলচাঁদ তাঁহাকে লইয়া পূর্ব্বোক্ত রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

ঘটনাক্রমে রাজবাটীর নাপ্‌তিনী এই রমণীর কেশ বন্ধন করিয়া দিত। একদিন ঠিক একই সময়ে রাণী ও এই রমণী নাপ্তিনীকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। সে প্রথমে এই রমণীর কেশ বন্ধন করিয়া তারপরে রাণীর নিকট আসিল। বিলম্ব হওয়াতে রাণী কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নাপ্‌তিনী বলিল—"লক্ষপতির স্ত্রীর চুল বাঁধিয়া আসিতেছি, তাই বিলম্ব হইল।"

রাণী বলিলেন—"অগ্রে আমার চুল না বাঁধিয়া তাহার চুল বাঁধিতে কেন গিয়াছিলে?" সে উত্তর করিল—"লক্ষপতি স্ত্রী দ্বিগুণ বেতন দেন। তাই অগ্রে তাঁহার চুল বাঁধিতে গিয়াছিলুম।" রাণী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"আমার অপেক্ষা কেমন ধনবতী রমণী আছে আমি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।" এইরূপ কথোপকথনের পর নাপ্তিনী লক্ষপতির রমণীকে আনিতে গেল।

"লক্ষপতির পত্নী" রাজবাটীতে আসিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজার দৃষ্টি অকস্মাৎ তাঁহার প্রতি মুহুর্ত্তের জন্য পতিত হইল। রাজা তাঁহার রূপলাবণ্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে রাণীস্থানীয় করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি নাপ্তিনীর সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। নাপ্তিনী বলিল—"কোন ছলে লক্ষপতিকে বিনষ্ট করিতে পারিলে আপনি সার্থকাম হইতে পারেন। একদিন আপনি নদীতে জলবিহার করিতে যান্ এবং মধ্য জলে গিয়া আপনার আংটীটি ফেলিয়া দিন ও বিমর্ষের ভান করুন। যখন লক্ষপতি বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞাসা করিবে আপনি একটি পাত্রে এক খিলি পান * রাখিয়া সহচরবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিবেন—'আমার

* রাজপুতদিগের মধ্যে এইরূপ প্রথা আছে যে রাজা কোন দুরূহ কার্য্য সাধন করিতে

প্রিয় আংটীটি জলে পড়িয়া গিয়াছে। ইহা না পাইলে আমি আহার নিদ্রা করিব না।' সর্দ্দারগণের মধ্যে লক্ষপতি প্রধান, সুতরাং তিনি ব্যতীত কেহই আংটী উদ্ধার কার্য্যের জন্য 'বিঁড়ি' গ্রহণ করিবে না। এইরূপ অসাধ্য কার্য্য সাধন করিতে গিয়া তিনি অবশ্যই বিনষ্ট হইবেন। তিনি বিনষ্ট হইলে আপনার পথ নিষ্কণ্টক হইবে।"

রাজা তাহাই করিলেন। একদিন তিনি জলবিহার করিতে গিয়া মধ্য জলে তাঁহার আংটীটি ফেলিয়া দিলেন ও সহচরবর্গকে ডাকিয়া বলিলেন—"আমার প্রিয় আংটীটি জলে পড়িয়া গিয়াছে। ইহা না পাইলে আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিব।" সকলে বলিয়া উঠিল—"লক্ষপতি সর্দ্দার-প্রধান তিনিই বিঁড়ি গ্রহণ করুন।" লক্ষপতির মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। অগত্যা তাহাকে বিঁড়ি গ্রহণ করিতে হইল। তিনি বিমর্ষ বদনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। নাগ সিংহ ও মণ্ডূপ সিংহ তাঁহার বিমর্ষের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন—"রাজার আংটী জলে পড়িয়া গিয়াছে। আমার উপর উহার উদ্ধারের ভার নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া মণ্ডুপ সিংহ তাঁহাকে বলিল—"কোন স্থানে আংটী পড়িয়াছে, আমাকে দেখাইয়া দিন, আমি তুলিয়া দেব।"

ফুলচাঁদ মণ্ডূপসিংহকে নির্দ্দিষ্ট স্থানটি দেখাইয়া দিলেন। মণ্ডূপ তৎক্ষণাৎ জল মধ্যে প্রবেশ করিয়া আংটীটি তুলিয়া আনিল। লক্ষপতি আংটীটি পাইয়া মহাহ্লাদে রাজসমীপে গমন করিলেন। রাজা আংটী পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও লক্ষপতিকে পুরস্কার পূর্ব্বক বিদায় দিয়া নাপ্তিনীকে ডাকাইলেন। নাপ্তিনীর প্রথম উপায় ব্যর্থ হইল। লক্ষ-পতিকে বিনষ্ট করিবার জন্য সে দ্বিতীয় উপায় উদ্ভাবন করিল। রাজ্য মধ্যে একটি গভীর কূপ ছিল। তন্মধ্যে একটি অজগর সাপ বাস করিত। নাপ্তিনী বলিল—"আপনি লক্ষপতিকে এই অজাগর সর্পের মণি আনিতে বলুন। তাহা হইলে তার বিনাশ অনিবার্য্য।" রাজা সভাসদগণকে ডাকিয়া

---

ইচ্ছা করিলে সর্ব্বসভাসমক্ষে একটী পাত্রে এক খিলি পান রাখিয়া দেন। যে কেহ কার্য্য ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি পানটী তুলিয়া লয়েন।

বলিলেন—"আমি রাজমুকুটে অজগর সর্পের মণি পরিধান করিব। মণিটি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা কর।" সকলেই এক স্বরে বলিয়া উঠিল—"সর্দ্দার প্রধান লক্ষপতিই এই কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করুন।" ফুলচাঁদের মস্তকে বজ্র পড়িল। তিনি বিড়ি গ্রহণ করিয়া বিমর্ষ ভাবে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। নাগসিংহ ও মণ্ডূপসিংহ তাঁহার বিমর্ষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—"রাজা অজগর সর্পের মণি চাহিয়াছেন।" নাগসিংহ বলিল—"প্রভু! আপনি চিন্তিত হইবেন না; আমি আপনাকে মণি আনিয়া দেব।" এই বলিয়া নাগসিংহ অজগর সর্পের নিকট গিয়া ফুলচাঁদের উপকারের কথা বিবৃত করিল এবং তদুপকারের প্রতিদান স্বরূপ তাহার মাণিকটি প্রার্থনা করিল। অজগর তাহার মাণিকটি নাগসিংহকে দান করিল। ফুলচাঁদ মণি পাইয়া হৃষ্টচিত্তে রাজার নিকট গমন করিলেন। রাজা মাণিক দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন ও তাঁহাকে সপুরস্কারে বিদায় দিয়া নাপ্তিনীকে ডাকাইলেন। তাহার দ্বিতীয় উপায়ও ব্যর্থ হইল। নাপ্তিনী বলিল—"আমি আর এক উপায় স্থির করিয়াছি। এই উপায় অবলম্বন করিলে লক্ষপতির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আপনি লক্ষপতিকে ডাকিয়া বলুন—"আমি পিতৃ পুরুষদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে ইচ্ছা করি। তুমি তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।" রাজা সভাসদদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"আমি পিতৃপুরুষগণকে ভোজ দিতে ইচ্ছা করি। তোমরা স্বর্গে গিয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।" আর সকলে বলিয়া উঠিল—"লক্ষপতি সর্দ্দারদিগের মধ্যে প্রধান। তিনিই এ দুষ্কর কার্য্য করিবার একমাত্র পাত্র। তিনিই বিঁড়ি গ্রহণ করুন।" নিরুপায় হইয়া ফুলচাঁদ অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে বিঁড়ি গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজন্! কি প্রকারে আমি স্বর্গারোহণ করিব?" রাজা বলিলেন—"পিতৃপুরুষগণ যে প্রকারে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তুমিও তাঁহাদের পথ অবলম্বন কর, অর্থাৎ চিতার মধ্য দিয়া স্বর্গে যাত্রা কর।" ফুলচাঁদ মহা চিন্তাকুল—মৃত্যুদণ্ডাধীনবৎ।

রাজাজ্ঞানুসারে তাঁহার জন্য চিতা নির্ম্মিত হইল। তিনি চিতা মধ্যে বসিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে রাশিকৃত কাষ্ঠ সন্নিবেশিত হইল। রাজ

ভৃত্যেরা কাষ্ঠ জ্বালাইয়া চলিয়া গেল—রাজাও দূর হইতে চিতা প্রজ্জ্বলিত দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে স্বপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা দরবার করিয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে সভাসদ্ কর্ত্তৃক দরবার পরিপূর্ণ, এমন সময়ে ফুলচাঁদ দরবার মধ্যে প্রবেশ করিলেন—দরবারীগণ ফুলচাঁদকে দেখিবামাত্র "ভূত! ভূত!" বলিয়া দরবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। ফুলচাঁদ রাজাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—"রাজন আপনার আদেশ মত আপনার পিতৃপুরুষদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতেছিলাম। দেখিলাম তাঁহারা বেশ সুখে আছেন। তাঁহারা আপনাকে আশীর্ব্বাদ দিয়া আমাকে বলিলেন—"রাজাকে বলিও আমরা মহাসুখে আছি। কেবল আমাদের এক কষ্ট আছে—ক্ষৌর কার্য্য অভাবে আমাদের বড় বড় চুল ও নখ হইয়াছে। রাজার নিকট পৌঁছিয়াই তাঁহার নাপ্তিনীকে এখানে পাঠাইয়া দিও।" রাজাদেশে ভৃত্যগণ নাপ্তিনীকে স্বর্গে পাঠাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। ফুলচাঁদ নাপ্তিনীকে বলিল—"স্বর্গে যাইতে কিছুমাত্র ভয় নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে একবার স্বর্গ সুখ পেলে তুই আর এখানে আস্তে চাহিবি না।"

রাজদূতগণ নাপ্তিনীকে চিতা মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল। পাপীর প্রায়শ্চিত্ত হইল। ফুলচাঁদ নিষ্কণ্টকে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ভাগ্যবলে ফুলচাঁদ হরগৌরীপ্রদত্ত অগ্নিনাশক প্রস্তর আংটীমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া ধারণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য অগ্নি তাঁহাকে নাশ করিতে পারে নাই।

শ্রীশোভনাসুন্দরী দেবী।

# দাক্ষিণাত্যে রাঠোড়বংশ। *

'রণবঁকা রাঠোড়।' †

রাঠোড়-বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটী প্রবাদ আছে নিম্নে তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার মুখ, ক্ষত্রিয়েরা ব্রহ্মার বাহু, বৈশ্যেরা ব্রহ্মার উরু এবং শূদ্রেরা ব্রহ্মার পা একে একে দখল করিয়া লইয়াছেন। এইরূপে ব্রহ্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে পর, রাঠোড়দিগের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। অতএব তাঁহারা ব্রহ্মা সদৃশ আর একটী "জদী" (বড়) দেবতা খুঁজিতে লাগিলেন। ইন্দ্র দেবতাদিগের "সর্দ্দার", সুতরাং রাঠোড়রা তাঁহার "রঠ" (রথ) অর্থাৎ মেরুদণ্ড কাটিয়া বা ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন। প্রসিদ্ধ আছে রাঠোড়গণ ইন্দ্রের মেরুদণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। 'রঠ' (রথ) হইতে উৎপন্ন বলিয়া রাঠোড় নাম হইল।

দ্বিতীয় প্রবাদটী এইরূপ।—রাঠোড়দিগের আদিকুলদেবী মনসা নামে পূজিত হইতেন। কালক্রমে বিন্ধ্যাচলে দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তৎসঙ্গে তাঁহার নামও পরিত্যক্ত হইল। তিনি মনসা নামের পরিবর্ত্তে বিন্ধ্যবাসিনী নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। অতঃপর একদা রাঠোড়দিগের পূর্ব্বপুরুষ জনৈক ক্ষত্রিয় মহা আগ্রহসহকারে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীকে পূজা করেন। তিনি ভক্তের প্রতি প্রীত হইয়া তৎগোত্রীয় রাজপুতদিগের রক্ষা হেতু স্বদেহ হইতে শ্যেনপক্ষীরূপা একটী দেবীর সৃষ্টি করিলেন। এতদ কারণে এই দেবীর "রাষ্ট্র সৈন্য" অর্থাৎ "দেশ-রক্ষয়িত্রী" নাম-করণ হইল। ‡

---

* এই প্রবন্ধ প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রফলক ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

† ইহা রাঠোড়গণের কুলশ্লোক বা কুলমন্ত্র, ইহার অর্থ "রণমজবুত রাঠোড়।"

‡ মিবার দেশে গিরিশীর্ষস্থ সুপ্রসিদ্ধ একলিঙ্গ (মহাদেবের) মন্দিরের সন্নিকটে 'রাষ্ট্র সেন্য' দেবীর মন্দির বিদ্যমান আছে। চিল পক্ষী শ্যেন পক্ষীর জ্ঞাতভাই। অতএব



রাঠোড় গণের রাজ তখমা।

এই ছবিটা রাঠোড়দিগের state crest বা রাজ তখ্‌মা। দুই ধারে দুটি শ্যেন পক্ষী আছে—একটী বিন্ধ্যবাসিনী দেবীকে ও অরেকটি (শ্যেন পক্ষীরূপা) রাষ্ট্রসৈন্য দেবীকে সূচনা করিতেছে। মধ্যে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি, কারণ রাঠোড়রা সূর্য্যবংশীয়। তন্নিম্নে রাঠোড়দিগের কুলশ্লোক আছে "রণবঁকা রাঠোড়" রাঠোড়গণ যুদ্ধপ্রিয় বলিয়া দুই ধারে দুই তরয়াল রহিয়াছে।

"রাষ্ট্র সৈন্য" দেবীর নামে রাঠোড়গণ "রাষ্ট্র-সৈন্য" নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। কালক্রমে 'রাষ্ট্র-সৈন্য' নামের শেষাংশের 'সৈন্য' শব্দের বিলোপ হইল। রাঠোড়গণ 'রাষ্ট্র' নামেই পরিচিত হইলেন। 'রাষ্ট্র' অর্থে 'দেশ' বা 'তদধিপতি'। রাঠোড়গণ 'রাষ্ট্র' শব্দের অগ্রপশ্চাৎ গৌরব সূচক পদ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, যথা 'মহারাষ্ট্র' (সকলের বড় দেশ), 'রাষ্ট্র-কূট' ও 'রাষ্ট্র বর্য্য' ('কূট' ও 'বর্য্য' শব্দ প্রায় একার্থ বাচক=সর্ব্বোত্তম।) ক্রমে 'রাষ্ট্রবর্য্য' শব্দের নানা অপভ্রংশ হইতে লাগিল, যথা 'রাঠবর' = 'রাঠবড়' = 'রাঠ-উর' = 'রাঠ-উড়' = 'রাঠড়' = 'রাঠোড়'। শেষোক্ত নামে রাঠোড়গণ অধুনা পরিচিত।

রাঠোড়গণ সূর্য্যবংশী, চন্দ্র বা যদুবংশী নহে। 'রাষ্ট্র সৈন্য' দেবীর বাহন পূর্ব্বে সিংহ ছিল। সিংহ দেবীগণের প্রিয় বাহন। রাঠোড়গণও দেবী উপাসক ছিলেন। কালক্রমে 'রাষ্ট্র সৈন্য দেবীর হিংস্র সিংহের পরিবর্ত্তে শান্ত বিহঙ্গম (অর্থাৎ গরুড়) বাহন হইল।

বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতের ধর্ম্ম জীবনে একটী মহা বিপ্লব সংসাধন করিয়াছিল। 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' এই মহামন্ত্র পরশ পাথরের ন্যায় হিন্দুদিগের নৃশংস ভাব সকল প্রেম, ভক্তি, দয়া ও কোমলতায় পরিণত করিয়াছিল। বৈষ্ণবধর্ম্মের তুফান রাঠোড়গণের জীবনও আন্দোলিত করিয়াছিল। সম্ভবতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মের আবির্ভাব কালেই রাঠোড়গণ 'রাষ্ট্র সৈন্য' দেবীর হিংস্র পশুর পরিবর্ত্তে শান্ত বিহঙ্গম বাহন করিয়াছিলেন। এইরূপ বাহন পরিবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়।

এতদ্ব্যতিরিক্ত আরেক কারণও থাকিতে পারে। রাঠোড় ও যাদব (যদুবংশীয় রাজপুত)গণের মধ্যে আন্তর্গোত্রীয় বিবাহ প্রচলিত ছিল, সুতরাং সৌহৃদ্য বশতঃ রাঠোড়েরা যদুকুলপতি কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর বাহন গরুড় পক্ষীকে 'রাষ্ট্র সৈন্য' দেবীর বাহনরূপে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। সচরাচর স্বগোত্রের

---

রাঠোড়েরা চিলকে খাদ্য দান করা মহা পুণ্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদিগের ধারণা যে চিলের সংখ্যা যত অধিক হইবে রাষ্ট্র সৈন্য দেবী তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে তত অধিক মনোযোগী হইবেন।

মধ্যে হিন্দুরা বিবাহ দেন না। যাদব ও রাঠোড়গণের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। অতএব রাঠোড়গণ যে যদুবংশী নহে তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে চন্দ্র, সূর্য্য ও যদুবংশীয় এই তিন প্রাচীন রাজপুত সম্প্রদায় বা রাজবংশ আছে। রাঠোড়েরা যদুবংশী নহে এবং চন্দ্রবংশীও হইতে পারে না। তাহার প্রমাণ রাঠোড়দিগের অন্য একটী নাম 'গধ্বাল' (Gadhwal)। এক জাতির এইরূপ বহু নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা শিশোদীয় রাজপুতদিগের অন্য নাম 'গোহেল' (গোহিলোত বা গহলোত); যাদব রাজপুতদিগের অন্য নাম 'ভাটী'; দেবর রাজপুতদিগের অন্য নাম 'হাড়া'; এবং সোনিগর রাজপুতদিগের অন্য নাম 'খীচী'। গধ্বাল নামে একটী স্বতন্ত্র সূর্য্যবংশীয় রাজপুত জাতিও আছে। রাঠোড়েরা সম্ভবতঃ এই গধ্বাল বংশের শাখা বিশেষ বলিয়াই ইহাদিগের অন্য নাম গধ্বাল। গধ্বাল ও রাঠোড় জাতি যে সমগোত্রজ তাহার প্রমাণ ইহাদিগের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান চলে না। গধ্বালরা সূর্য্যবংশোদ্ভব, অতএব রাঠোড়রাও খুব সম্ভবতঃ সূর্য্যবংশোদ্ভব।

পুরাকালে বৌদ্ধরাজ অশোকের সময় একটী রাষ্ট্রিক (রাঠোড়) গোত্রের রাজবংশ দাক্ষিণাত্য প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিল। এই রাষ্ট্রিক রাজাগণের নাম হইতে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের মহারাষ্ট্র নাম হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রিক রাজাগণ মহা পরাক্রান্ত ও মহা গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের দেশও 'মহা' শব্দের অংশীদার হইল অর্থাৎ মহারাষ্ট্র নামে খ্যাতি প্রাপ্ত হইল। সৌরাষ্ট্র ও লাঠ দেশও এই রাষ্ট্রিকগণের অধিকারভুক্ত ছিল। *

সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন দেশের নামকরণ প্রায় ইহার সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমী জাতি বিশেষের নামের অনুসরণ করে। রাজপুতানা, বুন্দেলখণ্ড, রোহিলখণ্ড প্রভৃতি দেশ ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। রাজপুতা-

---

* সৌরাষ্ট্র দেশ বর্ত্তমান কাঠিয়াড় দেশ সু-রাষ্ট্র হইতে 'সৌরাষ্ট্র' আসিয়াছে।
লাঠ দেশ মহানদী ও নর্ম্মদা নদী দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী। 'লাঠ' নাম 'রাঠ' নামের অপভ্রংশ হইলেও হইতে পারে। 'রলয়োরভেদঃ।'

ন্যায় রাজপুতগণ, বুণ্ডেলখণ্ডে বুণ্ডেলগণ, ও রোহিলখণ্ডে রোহিলাগণ অপরাপর জাতি অপেক্ষা অধিকতর বিক্রমী ও প্রভাবান্বিত ছিল। এইরূপে মহারাষ্ট্র নামও পরাক্রান্ত রাষ্ট্রিক রাজবংশের রাষ্ট্র নাম হইতে আসিয়াছে।

বৌদ্ধরাজ অশোকের পূর্ব্বে রাঠোড়গণ প্রথম উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিয়াছিলেন। অশোকের পরওয়ানায় দাক্ষিণাত্যের রাঠোড়বংশের উল্লেখ আছে দেখা যায়। খৃঃ অব্দের অন্যূন ২৫৭ বৎসর পূর্ব্বে মগধেশ্বর অশোকের অভ্যুদয় হইয়াছিল। অতএব রাঠোড়দিগের দাক্ষিণাত্যের সাম্রাজ্য অতি প্রাচীন। সম্বৎ অন্যূন ১০৩০ অব্দ যাবৎ এই রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। তৎপরে চালুক্য বংশীয় রাজা তৈলপ্‌ রাঠোড়দিগের দক্ষিণস্থ রাজ্য ধ্বংশ করেন।

রাঠোড়দিগের ৫০০ পাঁচশত সম্বতের পূর্ব্বের ইতিহাস ঘন তমসাচ্ছন্ন। দুএকটী ক্ষীণ রেখা ভিন্ন কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না।

সম্বৎ অন্যূন ৫০০ পাঁচশ অব্দে দাক্ষিণাত্যের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা মনঙ্গ ছিলেন। * তৎপরবর্ত্তী তিন রাজার নাম (২) দেবরাজ (রাজ=রায়=রাও), (৩) ভবেশ ও (৪) অভিমন্যু ছিল।

অভিমন্যু মনপুরে অবস্থিতি করিতেন। মনপুরের অন্য নাম "মন্যুক্ষেত্র", অর্থাৎ মনপুর রাঠোড়রাজ অভিমন্যুর নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৬৫০ ছশ পঞ্চাশ সম্বৎ পর্য্যন্ত রাঠোড়দিগের পুরাবৃত্ত - "নিহিতং গুহায়াং।"

৬৫০ সম্বৎ হইতে ১০৩০—৩১ সম্বৎ পর্য্যন্ত (দক্ষিণী) রাঠোড়দিগের বংশাবলীর বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ১০৩০—৩১ সম্বতে তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়।

৬৬০ সম্বৎ হইতে ১০৩০—৩১ সম্বতের মধ্যে উনিশ জন রাঠোড় রাজা দাক্ষিণাত্য প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। গুজরাট ও মধ্য ভারতেও রাঠোড়বংশের শাখা ছিল।

---

* পাঁচশত সম্বতের অভিমন্যু রাজের তাম্রফলকে 'মনঙ্গ' রাজার নামোল্লেখ আছে।

(২) বংশ তালিকা (দাক্ষিণাত্য)

(সম্বৎ ৬৫০—১০৩০—৩১)

দন্তীবর্ম্ম (প্রথম রাজা)

(প্রথম) ইন্দ্ররাজ (২ রাজা)

(প্রথম) গোবিন্দরাজ (৩ রাজা)

কর্করাজ (৪ রাজা)

(দ্বিতীয়) ইন্দ্ররাজ (৫রাঃ) — (প্রথম) কৃষ্ণরাজ (৭রাঃ)

(দ্বিতীয়) গোবিন্দরাজ (৮রাঃ) সম্বৎ ৮৪০ — ধ্রুবরাজ (৯রাঃ)

(তৃতীয়) গোবিন্দরাজ (১০রাঃ) সম্বৎ ৮৫১—৮৬৫ — ইন্দ্ররাজ (গুজরাটেশ্বর)

(প্রথম) অমোঘবর্ষ (১১রাঃ) সম্বৎ ৮৭২—৯৩৪

(দ্বিতীয়) কৃষ্ণরাজ (১২রাঃ) সম্বৎ ৯৩২—৯৬৮

যুগতুঙ্গ

(তৃতীয়) ইন্দ্ররাজ (১৩রাঃ) সম্বৎ ৯৭১—৯৭৩ — (তৃতীয়) অমোঘবর্ষ (১৬রাঃ)

(দ্বিতীয়) অমোঘবর্ষ (১৪রাঃ) — (চতুর্থ) গোবিন্দরাজ (১৫রাঃ) সম্বৎ ৯৭৬—৯৯০

(তৃতীয়) কৃষ্ণরাজ (১৭রাঃ) — যুগতঙ্গ — খোত্তিগ (১৮রাঃ) সম্বৎ ১০২৮ — নিরুপম

কর্করাজ (১৯রাঃ)
(নামান্তর চতুর্থ অমোঘবর্ষ)
সম্বৎ ১০২৯ বা ১০৩০

৬৫০ সম্বতে রাঠোড় রাজ দন্তীবর্ম্ম দাক্ষিণাত্যের রাজা ছিলেন। তৎপরে তদীয় পুত্র (প্রথম) ইন্দ্ররাজ রাজা হন। ইন্দ্ররাজের পর তৎপুত্র প্রথম গোবিন্দরাজ 'গদী' আরোহণ করিলেন। সম্বৎ ৬৯১ অব্দে গোবিন্দরাজ অপ্যেগ নামক রাজার সাহায্যে পুলকেশী নামক চালুক্যবংশীয় রাজাকে আক্রমণ করেন। অপ্যেগ পলায়ন করিল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি পুলকেশীর সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিলেন। এতদ্‌ঘটনায় ইহা প্রতীত হইতেছে যে গোবিন্দরাজ একটী পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন।

গোবিন্দরাজের পর তৎপুত্র কর্করাজ রাজা হইলেন। কর্করাজ দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণে বিভূষিত ছিলেন ও নানা যাগ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

কর্করাজের তিন পুত্র ছিল। (দ্বিতীয়) ইন্দ্ররাজ (৫ম রাজা), ধ্রুবরাজ, ও (প্রথম) কৃষ্ণরাজ (৭ম রাজা)। জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় ইন্দ্ররাজ পিতৃ সিংহাসন পাইলেন। তিনি একটী চালুক্যবংশীয়া রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎগর্ভে একটী পুত্রসন্তান হয়—দন্তীদুর্গ। দন্তীদুর্গের অপর দুই নাম—দন্তীবর্ম্ম ও বৈর(ব) মেঘ বল্লভ। দন্তীদুর্গ একজন সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন।

প্রথম ইন্দ্ররাজ হইতে দ্বিতীয় ইন্দ্ররাজ পর্য্যন্ত রাঠোড়দিগের রাজলক্ষ্মী সুপ্রসন্না ছিলেন না। তৎকাল যাবৎ রাঠোড়দিগের সৌভাগ্য সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইয়াছিল। দন্তীদুর্গের রাজত্বকালে রাঠোড়দিগের সৌভাগ্য 'সূর্য্য' রাহুমুক্ত হইলেন। ৭১০ সম্বতের একটী তাম্রফলকের দ্বারা জানা যায় যে রাঠোড়দিগের হীনাবস্থায় অর্থাৎ দন্তীদুর্গের পূর্ব্বপুরুষদিগের সময়ে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অধিকাংশ হস্তান্তর হইয়াছিল। দন্তীদুর্গ স্বীয় বাহুবলে হৃত ভূমি পুনরধিকৃত করিলেন। এতদ্ ব্যতিরিক্ত তিনি নানান্ নূতন দেশ জয় করিয়া রাজ্যের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি (৭৯১—৮০৪ সম্বতের মধ্যে) মাহী ও নর্ম্মদা নদীর অন্তর্গত লাঠ দেশ দখল করিয়া লইলেন। পরে (সম্বৎ ৮০৪—৮১০) কাঞ্চী, কীরল, চোল, পাণ্ড্য ও কর্ণাটেশ্বরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। অবশেষে চালুক্যরাজ রাজবল্লভকে পরাজিত করিয়া 'রাজাধিরাজ' ও 'পরমেশ্বর' পদবী গ্রহণ করিলেন। তিনি যুদ্ধে অজেয় ছিলেন, সুতরাং তিনি অজেয় বিশেষণে বিভূষিত হইয়াছিলেন।